

সাহিত্য শতদল

"*Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book on Bengali for Class VI, Vide Notification No. TB/74/VI/TB/211*"

(পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকরূপে অনুমোদিত)

সাহিত্য শতদল

[প্রথম স্তবক]

(ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য)

মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ এম. এ. (ইংরাজী ও বাংলা)
অধ্যাপক, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক,
আনন্দবাজার পত্রিকা

ও

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বি. এ.
প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক, দৈনিক বসুমতী

চিরঞ্জীব প্রকাশনী
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
৪২, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
চিত্ত সিংহ রায়
৪২, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৭৬

মূল্য : দুই টাকা কুড়ি পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীপরাণ চন্দ্র ঘোষ
পরাণ প্রেস
১১/এ, তারক প্রামানিক রোড
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

প্রকাশক :
চিত্ত সিংহ রায়
৪২, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৫
তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৭৬

মূল্য : দুই টাকা কুড়ি পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীপরাণ চন্দ্র ঘোষ
পরাণ প্রেস
৯৯/এ, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

গদ্যাংশ

পদ্যাংশ



মাতৃভক্তি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (বন্দ্যোপাধ্যায়) জন্ম ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে, মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তিনি কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে পড়াশুনা করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সম্যক অধিকার থাকায় 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান অতুলনীয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে তিনি পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হন। স্বচ্ছন্দ বাংলা গদ্য রচনার তিনি পথিকৃৎ। তাঁর রচনা মূলতঃ অনুবাদ-নির্ভর। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন]।

স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী ডণ্ডী নগরে, এক দরিদ্রা নারী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র শিশুসন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অনেক কষ্টে ও অনেক পরিশ্রমে কিছু কিছু উপার্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন।

লেখাপড়া না শিখিলে মূর্খ হইবে ও চিরকাল দুঃখ পাইবে, এই বিবেচনা করিয়া, তিনি লেখাপড়া শিখাইবার নিমিত্ত পুত্রকে এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও, আন্তরিক যত্ন ও সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাহার বয়স দ্বাদশ বৎসর হইল। এই সময়ে তাহার জননী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অবয়ব সকল অবশ ও

অকর্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। ইতঃপূর্বে, তিনি যে উপার্জন করিতেন, তদ্বারা কোনও রূপে, গ্রাসাচ্ছাদন ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় সম্পন্ন হইত, কিছুমাত্র উদ্‌বৃত্ত হইত না ; সুতরাং তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা যাওয়াতে, সকল বিষয়েই অতিশয় অসুবিধা উপস্থিত হইল।

জননীর এই অবস্থা ও ক্লেশ দেখিয়া পুত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, ইনি অনেক কষ্টে, আমায় লালনপালন করিয়াছেন ; ইঁহার স্নেহ ও যত্নেই, আমি এত বড় হইয়াছি, ও এতদিন পর্যন্ত জীবিত রহিয়াছি। এখন ইঁহার এই অবস্থা উপস্থিত। আমার প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত, ইনি এতদিন যত যত্ন ও যত পরিশ্রম করিয়াছেন, এক্ষণে ইঁহার জন্য আমার তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও অধিক পরিশ্রম করা উচিত। আমি থাকিতে ইনি যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমার বাঁচিয়া থাকা বিফল। আমার বার বৎসর বয়স হইয়াছে। এ বয়সে পরিশ্রম করিলে অবশ্যই কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিব।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, সেই সুবোধ বালক এক সন্নিহিত কারখানায় উপস্থিত হইল ; এবং তথাকার অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে কর্ম করিতে আরম্ভ করিল ; তাহার যেমন বয়স, সে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, সে যাহা পাইত, সমুদয় জননীর নিকট আনিয়া দিত। এই উপার্জন দ্বারা তাহাদের উভয়ের, অনায়াসে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে লাগিল।

কর্মস্থানে যাইবার পূর্বে, ঐ বালক, গৃহসংস্কার প্রভৃতি আবশ্যক কর্ম সকল করিয়া জননীর ও নিজের আহার প্রস্তুত করিত ; এবং

অগ্রে তাঁহাকে আহার করাইয়া, স্বয়ং আহার করিত। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিত; ইতোমধ্যে জননীর যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সে সমুদয় প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া যাইত।

বৃদ্ধা লেখাপড়া জানিতেন না, সুতরাং সমস্ত দিন একাকিনী শয্যায় পতিত থাকিয়া, কষ্টে কালযাপন করিতেন। পীড়িত অবস্থায় কোনও কর্ম করিতে পারিতেন না, এবং কেহ নিকটেও থাকে না। যদি পড়িতে শিখেন, তাহা হইলে অনায়াসে সময় কাটাইতে পারেন। এই বিবেচনা করিয়া, সেই বালক অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, অল্প দিনের মধ্যে, তাঁহাকে এত শিখাইলেন যে, তিনি তাঁহার অনুপস্থিতি কালে, সহজ সহজ পুস্তক পড়িয়া, স্বচ্ছন্দে, কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই বালক এইরূপ সুবোধ ও এইরূপ মাতৃভক্ত না হইলে, বৃদ্ধার দুঃখের অবধি থাকিত না। ফলতঃ, অল্প বয়স্ক বালকের এরূপ বুদ্ধি এরূপ বিবেচনা, এরূপ আচরণ, সচরাচর নয়নগোচর হয় না। প্রতিবেশীরা, তদীয় আচরণ দর্শনে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনুশীলনী

১। কাহিনীর দরিদ্রা নারী কি জন্য তাঁর পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন?

২। জননীর ক্লেশ দেখে পুত্রের মনে কি ভাবের উদয় হল? তাঁর দুঃখ দূর করার জন্য সে কি উপায় গ্রহণ করল, সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৩। এই কাহিনী পাঠে কি শিক্ষা লাভ করা যায়?

৪। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর :—অন্তঃপাতী, পক্ষাঘাত, গ্রাসাচ্ছাদন, ক্লেশ, সন্নিহিত, স্বচ্ছন্দে।

৫। বিপরীত শব্দ লেখ :—দরিদ্রা, মূর্খ, উদ্‌বৃত্ত, ক্ষমতা, অধিক।



বৃষ্টি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) পৈত্রিক নিবাস ২৪ পরগনার কাঁঠালপাড়া গ্রামে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট (বি-এ)। তিনি দীর্ঘকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বলা যায়। তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' সাহিত্য পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের নবীন লেখক সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়তা করেছে। উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি হিন্দু সমাজের সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। উপন্যাস ছাড়াও তিনি কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধেরও রচয়িতা। তিনি আমাদের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম্' এর উদ্গাতা। এই জন্য তাঁকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলা হয়]।

চল নামি—আষাঢ় আসিয়াছে—চল নামি। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা একজনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না। মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কণা মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে ?

দেখ, যে একা সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য, যাহার ঐক্য নাই সেই তুচ্ছ। দেখ ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্দ্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে লক্ষে লক্ষে অর্বুদে অর্বুদে এই বিশোষিত পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্বতের মাথায় চড়িয়া, তাঁহার গলা ধরিয়া বুকে পা দিয়া পৃথিবীতে নামিব, নির্ঝরপথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া তরঙ্গের উপর মহারঙ্গে ক্রীড়া করিব। এস সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু? ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ-দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র, তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করিব। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা স্রোতের মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাইব। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকিব। বায়ু! বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না। ঐক্যের বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল, আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণলতাবৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

দেখ দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে, নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে, চাষা চষিতেছে, কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা, দুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব। দে বেটির কাপড় ভিজিয়ে দে। যাক্—আমাদের বল দেখ! দেখ, পর্বতকন্দর দেশ-প্রদেশ ধুইয়া লইয়া নূতন দেশ নির্মাণ করিব। বিশীর্ণা সূত্রকায়া তটিনীকে কূলপ্লাবিনী জলরাক্ষসী করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—কোন দেশের মানুষ মারিব, কত জাহাজ বাহিব, কত

জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব। অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে?

অনুশীলনী

১। ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু কিভাবে বলবান্ হল তা নিজের ভাষায় সবিস্তারে লেখ।

২। বৃষ্টির দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার সাধিত হয় তার বিবরণ দাও।

৩। বৃষ্টি দেখে পৃথিবী আনন্দে কিভাবে মেতে ওঠে?

৪। বৃষ্টিবিন্দুর কথোপকথনের সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখ।

৫। ব্যাখ্যা লেখ :—(ক) যে একা সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য।
(খ) আমাদের বল……জলরাক্ষসী করিব।

৬। শব্দার্থ লেখ :—বিশোষিত, স্ফটিক, মহারঙ্গে, বিশীর্ণা, কূলপ্লাবিনী।

৭। বিপরীত শব্দ লেখ :—শুষ্ক, ক্ষুদ্র, শূন্যহৃদয়, গোলাম, জলময়।

৮। কোনটি কোন পদ লেখ :—আষাঢ়, কণা তুচ্ছ, আহ্লাদ, মহারঙ্গে।

9710



ধাত্রী পান্না

রজনীকান্ত গুপ্ত

[বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসের গল্প রচনায় অগ্রণী রজনীকান্ত ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 'সপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সম্পদ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিরোধান ঘটে]।

মেবারের অত্যুজ্জ্বল সূর্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। তাহার শিশুসন্তান আজ শত্রুর হস্তগত। ভবিষ্যৎ বিপদে অনভিজ্ঞ ষড়্‌বর্ষীয় বালক নিশ্চিন্তমনে আহার-পানে পরিতুষ্ট হইতেছে, নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছে; এদিকে দুরন্ত শত্রু যে তাহার প্রাণ-নাশের চেষ্টা পাইতেছে, সরল ও অনভিজ্ঞ শিশু তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। দাসীপুত্র বনবীর মেবারের সিংহাসন অধিকারের আশায় এই কোমল কোরকটিকে বৃন্তচ্যুত করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছে। বাপ্পারাও-এর পবিত্র বংশ নির্মূল করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে, এ বংশকে আজ উদ্ধার করিবে কে? এক অসহায়া রমণী এই ঘোর বিপদ হইতে উদয়সিংহকে উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইতেছে, অনাথ বালক এক তেজস্বিনী ধাত্রীর আশ্রয়ে থাকিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিতেছে। ধাত্রী পান্না অশ্রুতপূর্ব স্বার্থত্যাগ বলে বাপ্পারাও-এর বংশধরকে জীবিত রাখিতে উদ্যত হইয়াছে।

কি উপায়ে পান্না এই দুষ্কর কার্য সাধন করিল, কি উপায়ে পিতৃহীন শিশু অক্ষত শরীরে রহিল, তাহা মনে করিলেও প্রাণ

শিহরিয়া উঠে। রাত্রিকালে উদয়সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত রহিয়াছে এমন সময় একজন নাপিত আসিয়া ধাত্রীকে জানাইল, বনবীর উদয়সিংহকে হত্যা করিতে আসিতেছে। ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারির মধ্যে নিদ্রিত উদয়সিংহকে রাখিয়া এবং তাহার উপরিভাগ পত্রাদিতে ঢাকিয়া উক্ত চাঙ্গারি নাপিতের হস্তে সমর্পণ করিল। বিশ্বস্ত নাপিত সেই চাঙ্গারি লইয়া কোনও নিরাপদ স্থানে গেল। এমন সময় বনবীর অসি হস্তে সেই গৃহে আসিয়া ধাত্রীকে উদয়সিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ধাত্রী বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিল না— নীরবে ও অধোমুখে স্বীয় নিদ্রিত পুত্রের দিকে অঙ্গুলি-প্রসারণ করিল। বনবীর উদয়সিংহবোধে এই ধাত্রীপুত্রের প্রাণসংহার করিয়া চলিয়া গেল।

এইরূপে পান্না অবলীলাক্রমে ও অসংকোচে আপনার হৃদয়রঞ্জন শিশুসন্তানকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিয়া মহারাণা সংগ্রামসিংহের পুত্রের প্রাণরক্ষা করিল। যে রমণী চিতোরের জন্য, বাপ্পারাও-এর বংশরক্ষার নিমিত্ত, জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুত্তলী, নয়নতারা সন্তানকে মৃত্যুর মুখে সমর্পণ করে, যে রমণী হৃদয়রঞ্জন কুসুমকোরককে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও আপনার কর্তব্যসাধনে বিমুখ হয় না, সে রাক্ষসী না দেবী! তুমি পান্নাকে রাক্ষসী বলিয়া ঘৃণা করিতে পার, কিন্তু এই মহান্ স্বার্থত্যাগ ও এই মহীয়সী ধাত্রীকে আর এক ভাবে চাহিয়া দেখিবে।

অনুশীলনী

১। বনবীরের হাত থেকে পান্না উদয়সিংহকে কিভাবে বাঁচিয়েছিলেন?

২। ধাত্রী পান্না রাক্ষসী, না দেবী? তাঁর স্বার্থত্যাগের ঘটনাটি অশ্রুতপূর্ব কেন?

৩। টীকা লেখ:—মেবার, বনবীর, বাপ্পারাও, উদয়সিংহ, চিতোর।

৪। কোনটি কোন পদ লেখ:—ষড়্‌বর্ষীয়, প্রসারণ, পুত্তলী, মহান্।

৫। অর্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর:—শিশুসন্তান, বৃন্তচ্যুত, উদ্যত, হৃদয়রঞ্জন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[নৈহাটির বিশিষ্ট ভট্টাচার্য পরিবারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১) জন্ম। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ থেকে মাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে এম. এ. পাশ করেন ও শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি প্রথমে গ্রন্থাগারিক এবং পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন ও মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করেন। অবসর গ্রহণের দীর্ঘদিন পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্ম থেকেই তিনি এ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও তুবার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। চর্যাপদের পুথি আবিষ্কার তাঁর এক উজ্জল কীর্তি। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা', 'বাল্মীকির জয়', 'প্রাচীন বাংলার গৌরব', 'বৌদ্ধ ধর্ম' এবং 'কাঞ্চনমালা' (উপন্যাস) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য]।

বৌদ্ধ জগতে দীপঙ্করের নাম প্রসিদ্ধ। তিব্বতের শ্রেষ্ঠ ধর্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতন দীপঙ্করের শিষ্য ছিলেন। এখনও তিব্বতের প্রধান লামা ও চীনের ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁহার নাম শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

দীপঙ্কর বঙ্গদেশের পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী, মাতার নাম প্রভাবতী। দীপঙ্করের পিতামাতা তাঁহাকে চন্দ্রগর্ভ বলিয়া ডাকিতেন। শৈশবে তিনি জিতারি নামক একজন অবধূতের নিকট বাল্যশিক্ষার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তারপর দর্শন ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে মনোযোগী হইয়াছিলেন। দীপঙ্করের যেমন বয়স বাড়িতে লাগিল, তেমনই তাঁহার যশও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে পণ্ডিতগণ তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য আসিয়া শেষটা

নিজেরাই পরাজিত হইয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি ওদন্তপুরের বৌদ্ধাচার্য শীলরক্ষিতের নিকটে শ্রীজ্ঞান উপাধি লাভ করেন। একত্রিশ বৎসরের সময় তিনি ভিক্ষু হইয়া বিক্রমশীলা বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রধান পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা) ছিল বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রসিদ্ধ স্থান। সেখানে চন্দ্রকীর্তি নামে একজন আচার্য ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। বিক্রমশীলার মঠের অধ্যক্ষ দীপঙ্করকে সুবর্ণদ্বীপে পাঠাইলেন।

দীপঙ্কর চারি বৎসরকাল সুবর্ণদ্বীপে থাকিয়া সেখানকার বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন এবং সেখানকার বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তখন নালন্দার চেয়েও বিক্রমশীলার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অধিক ছিল।

এই সময়ে তিব্বত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় লোপ হইয়া আসে। এইজন্য তিব্বত দেশের রাজা বিক্রমশীলা বিহার হইতে দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। দীপঙ্কর কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একদিন তিব্বতের রাজা বা লামা তাঁহাকে "অতীশ" (সর্বশ্রেষ্ঠ) বলিয়া পূজা করিবেন। বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কারের জন্য তিব্বতের তদানীন্তন লামার একান্ত আগ্রহ ছিল। এইজন্য তিনি ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিহারে কয়েকজন তরুণ শ্রমণকে (ভিক্ষুকে) পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা কাশ্মীর প্রভৃতি ভারতের নানাস্থানে বৌদ্ধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অবশেষে বিক্রমশীলায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহারাই দেশে ফিরিয়া দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যের কথা প্রচার করায় লামা তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। দীপঙ্কর দুই একবার তিব্বতে যাইতে

অস্বীকার করিয়াছিলেন। অবশেষে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া সেখানে যাইতে স্বীকার করিলেন। তখন দীপঙ্করের বয়স সত্তর বৎসর।

এই বয়সে বরফে ঢাকা দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতারোহণ করা যে কি ক্লেশ-জনক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। দীপঙ্কর যখন তিব্বতের গুজে নামক স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন, তখন রাজার প্রেরিত একশত শ্বেত পরিচ্ছদ-পরিহিত অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে ছিল ছোট ছোট নিশান, সাদা রঙের কুড়িটি ছাতা, আর নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র। এই অশ্বারোহীরা অতি মধুর স্বরে বাদ্যযন্ত্রের সহিত "ওঁ মণিপদ্মে হুম্" এই গান গাহিয়া লামার নামে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। তিব্বতের এক মঠের গায়ে অতীশের এই অভ্যর্থনার চিত্র অঙ্কিত আছে।

মহাপুরুষ দীপঙ্করের শিক্ষাগুণে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে নূতন জীবনের ধারা সঞ্চারিত হইয়াছিল। সেখানে যাইয়া তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। আজিও সহস্র সহস্র লোক দীপঙ্করকে দেবতা বলিয়া পূজা করে।

অনুশীলনী

১। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? প্রথম জীবনে তাঁর পাণ্ডিত্য কোন ঘটনায় স্বীকৃতি লাভ করে?

২। তিব্বতের লামা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে কেন তিব্বতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন? দীপঙ্কর সেখানে কিরূপ অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন?

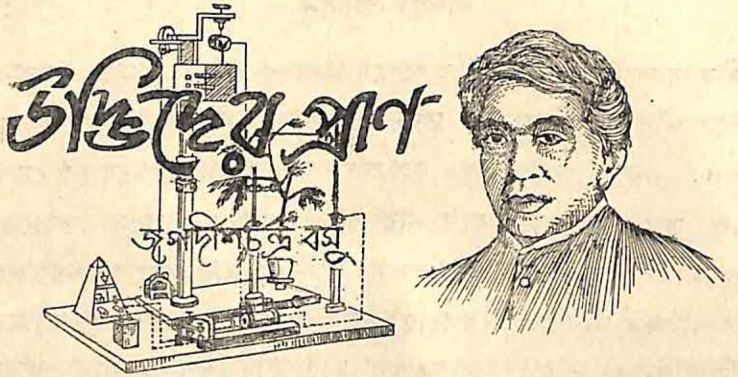
৩। সুবর্ণদ্বীপে দীপঙ্কর কি কি কাজ করেছিলেন?

৪। আজিও সহস্র সহস্র লোক দীপঙ্করকে কেন দেবতা বলে পূজা করে?

৫। অর্থ লেখ :—আচার্য, সংস্কার, খ্যাতি, তদানীন্তন, আগ্রহ, উপনীত।

৬। টীকা লেখ :—ভিক্ষু, বিক্রমশীলা, নালন্দা, সুবর্ণদ্বীপ।

৭। পদ নির্ণয় কর :—প্রধান, শৈশব, পরাজিত, আগ্রহ, পূজা।



[বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্রের জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি দীর্ঘকাল প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। রেডিওর তিনি প্রথম উদ্ভাবক। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে তাঁর অবদান বিশেষ সমাদৃত। তাঁর মৃত্যুর পর (১৯৩৮) বিজ্ঞান গবেষণার জন্য তাঁরই অর্থে কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' স্থাপিত হয়েছে]।

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোন দিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষই কি সব কথা মুখ ফুটিয়া বলে? আর যাহা মুখ ফুটিয়া বলে না তাহা কি কথা নয়? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না, আবার মুখ ফুটিয়া যে দুই চারিটি কথা বলে, তাহাও এমন আধআধ, ভাঙ্গাভাঙ্গা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহা নয়। আমাদের খোকা সকল কথা মুখ ফুটিয়া বলে না; চক্ষু, মুখ ও হাত নাড়া, মাথা নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার-ইঙ্গিতে অনেক কথা কয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না।

তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন, ছেলে কি চায়। অনেক সময় কথার আবশ্যক হয় না। ভালবাসিয়া

দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত; তারপর গাছ, পাখী, কীট-পতঙ্গদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি, সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোন কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মত আহার করে, দিন দিন বাড়ে, আগে এসব কিছুই জানিতাম না, এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মত অভাব, দুঃখকষ্ট দেখিতে পাই। জীবন ধারণ করিবার জন্য ইহাদেরও কষ্ট সহিয়া থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি-ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে এককে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ স্বার্থত্যাগ—গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন, সন্তানের জন্য নিজের জীবনদান উদ্ভিদে সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়া মাত্র। তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। আচ্ছা, বল ত—এই গাছ, আর এই মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে, আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত, তাহা ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ সে নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ? বস্তুতে গতি দেখা যায়, জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন

ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখীর ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম। বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটির উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর একটি কঠিন ঢাকনা, তাহার মধ্যে বৃক্ষশিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানা প্রকার—কোনটি অতি ছোট, কোনটি বড়, বীজ দেখিয়া গাছ কত বড় হইবে, বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বট-গাছ সরিষা অপেক্ষা ছোট বীজ হইতে জন্মে। কে মনে রাখিতে পারে, এত বড় গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে ? তোমরা হয়ত কৃষকদিগকে ধান্যের বীজ ক্ষেতে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছপালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখীরা ফল খাইয়া দূরদেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূরদেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমূল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমূল ফল রৌদ্রে ফাটিয়া যায়, তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম ; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে বীজ দিন-রাত্রি, দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কিনা কেহ বলিতে পারে না। হয়ত কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল সেখানে আর অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত

বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাকনা গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

অনুশীলনী

১। গাছেরা কিভাবে তাদের মনের ভাব জানায় ?

২। বীজ থেকে গাছ কিভাবে জন্মায় সংক্ষেপে তার বিবরণ দাও।

৩। জীবিত ও মৃতের মধ্যে প্রভেদ কি ?

৪। ব্যাখ্যা কর :—(ক) ভালবাসিয়া দেখিলে শুনিতে পাওয়া যায়।
(খ) গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়া মাত্র।

৫। শব্দার্থ লেখ :—আধআধ, আকার-ইঙ্গিতে, আবশ্যক, সচরাচর, অঙ্কুর, নিরাপদে।

৬। কোনটি কোন পদ লেখ :—ভাঙ্গাভাঙ্গা, শিখিয়াছি, শুষ্ক, চিহ্ন, অঙ্কুর।

৭। বাক্য রচনা কর :—আধআধ, আকার-ইঙ্গিতে, জীবনদান, ছেলেবেলায়, দেশ-দেশান্তরে।

৮। বিপরীত শব্দ লেখ :—জীবিত, দুঃখকষ্ট, বন্ধুতা, সর্বোচ্চ, কঠিন।

ছেলেবেলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় নেতাদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ স্কুল কলেজে শিক্ষা গ্রহণ না করেও নিজের অসামান্য প্রতিভা ও তীক্ষ্ণ মনীষায় বিশ্ববিদ্যার নানা ক্ষেত্র থেকে রত্নরাজি সংগ্রহ করে স্বীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করেন। রবীন্দ্র প্রতিভার স্পর্শে ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠেনি বাংলা সাহিত্যের এমন কোন শাখা দুর্লভ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সঙ্গীত, নাটক, ভ্রমণ-কাহিনী, রূপক-নাটক, প্রহসন, ব্যঙ্গকৌতুক, ধর্মোপদেশ, শিক্ষা, রাজনীতি, শব্দ-ছন্দ-ভাষা তত্ত্ব বিজ্ঞান, অনুবাদ প্রভৃতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি জীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থ বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' (Gitanjali) কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্যে 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন। শান্তিনিকেতনে স্থাপিত 'বিশ্বভারতী' শিক্ষাকেন্দ্র ও শ্রীনিকেতনে কৃষি ও কুটিরশিল্প পরিকল্পনা তাঁর স্বদেশী সমাজ সচেতনতার নিদর্শন। চিত্রশিল্পী ও সুরকার রূপেও তিনি বিশ্বখ্যাত।

আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাক্‌রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর-গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস্‌ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত। বাবুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পাল্কি চড়ে কেউ বা ভাগের গাড়িতে। যাঁরা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ি ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার-আধ-ঘোমটাওয়ালা ; কোচ্‌বাক্সে কোচ্‌মান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে। মেয়েদের বাইরে যাওয়া-আসা

ছিল দরজাবন্ধ পাল্কির হাঁপ-ধরানো অন্ধকারে। গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। রোদ-বৃষ্টিতে মাথায় ছাতা উঠত না। কোনো মেয়ের গায়ে সেমিজ পায়ে জুতো দেখলে সেটাকে বলত মেম-সাহেবি; তার মানে, লজ্জাশরমের মাথা খাওয়া। কোন মেয়ে যদি হঠাৎ পড়ত পর-পুরুষের সামনে, ফস্ করে তার ঘোমটা নামত নাকের ডগা পেরিয়ে, জিভ কেটে চট্ করে দাঁড়াত সে পিঠ ফিরিয়ে। ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ, তেমনি বাইরে বেরোবার পাল্কিতেও; বড়ো মানুষের ঝি-বউদের পাল্কির উপরে আরও একটা ঢাকা থাকত চাপা মোটা ঘটাটোপের। দেখতে হত যেন চলতি গোরস্থান। পাশে পাশে চলত পিতলে-বাঁধানো লাঠি হাতে দারোয়ানজি। ওদের কাজ ছিল দেউড়িতে বসে বাড়ি আগ্‌লানো, দাড়ি চোম্‌ড়ানো, ব্যাঙ্কে টাকা আর কুটুম বাড়িতে মেয়েদের পৌঁছিয়ে দেওয়া আর পার্বণের দিনে গিন্নিকে বন্ধ পাল্কি-সুদ্ধ গঙ্গায় ডুবিয়ে আনা; দরজায় ফেরিওয়ালা আসত বাক্স সাজিয়ে, তাতে শিউনন্দনেরও কিছু মুনাফা থাকত। আর ছিল ভাড়াটে গাড়ির গাড়োয়ান, বখরা নিয়ে বনিয়ে থাকতে যে নারাজ হত সে দেউড়ির সামনে বাধিয়ে দিত বিষম ঝগড়া। আমাদের পালোয়ান জমাদার শোভারাম থেকে থেকে বাঁও কষত, মুগুর ভাঁজত মস্ত ওজনের, বসে বসে সিদ্ধি ঘুঁটত কখনও বা কাঁচা শাক-সুদ্ধ মুলো খেত আরামে, আর আমরা তার কানের কাছে চীৎকার করে উঠতুম 'রাধাকৃষ্ণ'; সে যতই হাঁ-হাঁ করে দুহাত তুলত আমাদের জেদ ততই বেড়ে উঠত। ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।

তখন শহরে না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি; কেরোসিনের আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো। আমাদের পড়বার ঘরে জ্বলত দুই সলতের একটা সেজ।

মাস্টার-মশায় মিট্‌মিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্স্ট্ বুক। প্রথমে উঠত হাই, তার পর আসত ঘুম, তার পর চলত চোখ-রগড়ানি। বার বার শুনতে হত মাস্টার-মশায়ের অন্য ছাত্র সতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একলা মুর্খ হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারত না। রাত্রি ন'টা বাজলে ঘুমের ঘোরে ঢুলুঢুলু চোখে ছুটি পেতুম। বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার সরু পথ ছিল খড়-খড়ির আব্রুদেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত, কি জানি কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূত প্রেত ছিল গল্প গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্ দাসী কখন হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকী সুর, দড়াম করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়ে ভূতটা সবচেয়ে ছিল বদ্‌মেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘন পাতাওয়ালা বাদাম গাছ তারই ডালে এক পা আর অন্য পা-টা তেতলার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোন্ মূর্তি। তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না। দাদার এক বন্ধু যখন গল্পটা হেসে উড়িয়ে দিতেন, তখন চাকররা মনে করত, লোকটার ধর্মজ্ঞান একটুও নেই; দেবে একদিন ঘাড় মটকিয়ে, তখন বিদ্যে যাবে বেরিয়ে! সে সময়টাতে হাওয়ায় হাওয়ায় আতঙ্ক এমনি জাল ফেলেছিল যে, টেবিলের নিচে পা রাখলে পা সুড়্‌সুড়্ করে উঠত।

তখন জলের কল বসে নি। বেহারা বাঁখে করে কলসী ভরে মাঘ-ফাগুনের গঙ্গার জল তুলে আনত। একতলার অন্ধকার ঘরে সারি সারি ভরা থাকত বড়ো বড়ো জালায় সারা বছরের খাবার জল।

নিচের তলায় সেই-সব স্যাৎসেঁতে এঁধো কুটুরিতে গা ঢাকা দিয়ে যারা বাসা করে ছিল, কে না জানে তাদের মস্ত হাঁ, চোখ দুটো বুকে, কান দুটো কুলোর মতো, পা দুটো উল্টোদিকে। সেই ভুতুড়ে ছায়ার সামনে দিয়ে যখন বাড়ি-ভিতরের বাগানে যেতুম, তোলপাড় করত বুকের ভিতরটা, পায়ে লাগত তাড়া।

তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে দেওয়া হত, ঝর্ ঝর্ কল্ কল্ করে ঝরনার মত জল ফেনিয়ে পড়ত। মাছগুলো উল্টোদিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি-গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ ছায়া পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদাম গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই ব্রহ্মদত্যির ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার সময়কার জীবনযাত্রা বর্ণনা কর।

২। "ইষ্টদেবতার নাম শোনবার জন্যে ঐ ছিল তার ফন্দি।" কার ফন্দির কথা বলা হয়েছে?

৩। "পিঠ উঠত শিউরে।" কেন পিঠ শিউরে উঠত?

৪। ব্যাখ্যা লেখ :—(ক) পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়াগাঁয়ের সবুজ ছায়া পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে।

(খ) ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।

৫। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর :—শ্যাক্‌রাগাড়ি, কোচ্‌ম্যান, সেজ, পাল্কী, ঘটাটোপ, ফার্স্ট্ বুক।



[কলকাতার সিমলা পল্লীর দত্ত পরিবারে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জেনারেল এ্যাসেম্বলি কলেজ (অধুনা স্কটিশ চার্চ) থেকে বি. এ. পাশ করেন। ফুটবল ও ক্রিকেট ছাড়া সঙ্গীতেও তিনি নিপুণ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন; সন্ন্যাসজীবনে তাঁর নাম হল—স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর ভাষণ ইতিহাস সৃষ্টি করে। ১৯০২ সালে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁর বাণী ও আদর্শ সমাজ ও স্বদেশ সেবায় গত ৫০ বছর ধরে বাঙালী যুবকদের উদ্বুদ্ধ করে আসছে]।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে পঞ্চপাণ্ডব মিলিয়া একটি মহাযজ্ঞ করিলেন। সকলে ঐ যজ্ঞের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল, আর বলিতে লাগিল—"জগতে পূর্বে এরূপ যজ্ঞ আর হয় নাই।" যজ্ঞশেষে এক ক্ষুদ্রকায় নকুল আসিয়া উপস্থিত। তাহার অর্ধ শরীর হিরণ্ময়, অপরার্ধ পিঙ্গলবর্ণ। সে সেই যজ্ঞভূমির মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তারপর সে চারিদিকের লোকেদের বলিল—"তোমরা সকলে মিথ্যাবাদী ইহা যজ্ঞই নহে।"

তাহারা বলিতে লাগিল—"কি! তুমি বলিতেছ, ইহা যজ্ঞ নহে? তুমি কি জান না, এই যজ্ঞে রাজভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া দান করা হইয়াছে। মানুষ ইহার মত অদ্ভুত যজ্ঞ আর করে নাই।"

নকুল বলিল—"শুনুন, কোন গ্রামে এক গরীব ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া বাস করিতেন। সেই দেশে এক সময়ে তিন বৎসর ধরিয়া দুর্ভিক্ষ ঘটিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পূর্বের চেয়েও অধিক কষ্ট পাইতে লাগিলেন।

"অবশেষে সেই পরিবারকে তিনদিন ধরিয়া উপবাস করিতে হইল। চতুর্থ দিনে পিতা সৌভাগ্যক্রমে কিছু যবের ছাতু সংগ্রহ করিয়া তাহা চারিভাগে ভাগ করিলেন। তাঁহারা ভোজনে বসিবেন, এমন সময় দরজায় ঘা পড়িল। পিতা দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, এক অতিথি দাঁড়াইয়া আছেন।

"ব্রাহ্মণ বলিলেন—'আসুন মহাশয়! স্বাগত, স্বাগত।' তারপর তিনি অতিথির সম্মুখে নিজ ভাগের খাদ্য রাখিলেন। অতিথি অতি শীঘ্রই উহা নিঃশেষ করিয়া আরও চাহিলেন। তখন পত্নী স্বামীকে বলিলেন—'উহাকে এখন আমার ভাগও দিন।' স্বামী কহিলেন—'না, তাহা হইবে না।' কিন্তু স্ত্রী জোর করিয়া নিজ খাদ্যের ভাগ অতিথিকে দিলেন। অতিথি তৎক্ষণাৎ তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন—আমি এখনও ক্ষুধায় জ্বলিতেছি! তখন পুত্রবধূ ও পুত্র তাঁহাদের ভাগ দিলেন। এইবার তাঁহার আহার পর্যাপ্ত হইল।

"সেই রাত্রে ঐ চারিটি লোক অনাহারে দারুণ ক্লেশ সহ্য করিলেন। খাদ্যের গুঁড়া কিছু মেজেয় পড়িয়াছিল। উহার উপর যখন আমি গড়াগড়ি দিলাম আমার অর্ধেক শরীর সুবর্ণময় হইয়া গেল। তদবধি আমি সমুদয় জগৎ খুজিয়া বেড়াইতেছি। ইচ্ছা যে কোথাও এইরূপ আর একটি যজ্ঞ দেখিব। কিন্তু সেরূপ যজ্ঞ

আর একটিও দেখিতে পাইলাম না, আমার শরীরের অপরার্ধও আর সুবর্ণে পরিণত হইল না। সেই জন্যই আমি বলিতেছি, ইহা যজ্ঞই নহে।”

অনুশীলনী

১। পঞ্চপাণ্ডবের যজ্ঞকে কি অর্থে মহাযজ্ঞ বলা হয় ?

২। নকুলের শরীরের অপর অর্ধ সোনা হয়ে গেল না কেন ?

৩। “এইবার তাঁহার আহার পর্যাপ্ত হইল।”—তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

৪। নকুল বর্ণিত কাহিনীটি নিজের ভাষায় লেখ। কাহিনী থেকে কি শিক্ষা লাভ করা যায় ?

৫। শব্দার্থ লেখ :—

কুরুক্ষেত্র, জাঁকজমক, ঐশ্বর্য, হিরণ্ময়, পিঙ্গলবর্ণ, অতিথি, স্বাগত, তৎক্ষণাৎ, পর্যাপ্ত, ক্লেশ, সুবর্ণময়, মৃত্তিকা।

৬। বাক্যরচনা কর :—

মহাযজ্ঞ, গড়াগড়ি, দুর্ভিক্ষ, নিঃশেষ, পরিণতি।

৭। বিপরীত শব্দ লেখ :—

অবসানে, গরীব, দরিদ্র, ক্ষুদ্রকায়, পর্যাপ্ত।



[অবনীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় চিত্রশিল্পরীতি পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর দান অপরিসীম। তাঁর আঁকা কয়েকখানি চিত্র জগতের সর্বত্র সমাদৃত। বাংলা গদ্যে চলতি ভঙ্গীর বিকাশে তাঁর অবদান অসামান্য। ছেলেদের জন্যে তাঁর লেখা 'রূপকথা' 'ভূতপতরীর দেশ' 'ক্ষীরের পুতুল' প্রভৃতি অতুলনীয়। তাঁর মৃত্যুর (১৯৫১) পর তাঁর নামে কলকাতার শিশুদের জন্য 'অবনমহল' (লিটল্ থিয়েটার) নির্মিত হয়েছে]।

স্বর্গ থেকে ইন্দ্রদেবের রথ এসে রাজা দুষ্মন্তকে দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে স্বর্গপুরে নিয়ে এল। সেখানে দৈত্যদের সঙ্গে কত যুদ্ধ করে রাজা রাজ্যে ফিরছেন—এমন সময় দেখলেন, পথে হেমকূট পর্বত, মহর্ষি কশ্যপের আশ্রম।

এই আশ্রমে অনেক তাপস, অনেক তপস্বিনী থাকতেন, অনেক অপ্সর, অনেক অপ্সরা থাকত। আর থাকত—শকুন্তলা আর তার পুত্র রাজপুত্র সর্বদমন।

রাজা দুষ্মন্ত যেমন দেশের রাজা ছিলেন তাঁর সেই রাজপুত্র তেমনি বনের রাজা ছিল। বনের যত জীবজন্তু তাকে বড়ই ভালোবাসত।

সেই বনে সাত ক্রোশ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ ছিল, তার তলায় একটা প্রকাণ্ড অজগর দিনরাত্রি পড়ে থাকত। এই গাছতলায় সর্বদমনের রাজসভা বসত। হাতিরা তাকে সেই সাপের পিঠে বসিয়ে

দিত—এই তার রাজসিংহাসন। দুদিকে দুই হাতি পদ্মফুলের চামর দোলাত, অজগর ফণা মেলে মাথায় ছাতা ধরত। ভালুক ছিল মন্ত্রী, সিংহ ছিল সেনাপতি, বাঘ চৌকিদার, শেয়াল ছিল কোটাল ; আর ছিল—শুক-পাখি তার প্রিয়সখা, কত মজার মজার কথা বলত, দেশ-বিদেশের গল্প করত। সে পাখির বাসায় পাখির ছানা নিয়ে খেলা করত, বাঘের বাসায় বাঘের কাছে বসে থাকত—কেউ তাকে কিছু বলত না। সবাই তাকে ভয়ও করত, ভালোও বাসত।

রাজা যখন সেই বনে এলেন তখন রাজপুত্র একটা সিংহশিশুকে নিয়ে খেলা করছিল, তার মুখে হাত পুরে দাঁত গুনছিল, তাকে কোলে পিঠে করছিল, তার জটা ধরে টানছিল। বনের তপস্বিনীরা কত ছেড়ে দিতে বলছিলেন, কত মাটির ময়ূরের লোভ দেখাচ্ছিলেন ; শিশু কিছুতেই শুনছিল না।

এমন সময় রাজা সেখানে এলেন, সিংহশিশুকে ছাড়িয়ে সেই রাজশিশুকে কোলে নিলেন ; দুষ্টু শিশু রাজার কোলে শান্ত হল। সেই রাজশিশুকে কোলে করে রাজার বুক যেন জুড়িয়ে গেল। রাজা তো জানেন না যে এ শিশু তাঁরই পুত্র! ভাবছেন—পরের ছেলেকে কোলে করে মন কেন এমন হল, এর উপর কেন এত মায়া হল ?

এমন সময় শকুন্তলা অঞ্চলের নিধি কোলের বাছাকে খুজতে খুজতে সেইখানে এলেন। রাজারানীতে দেখা হল, রাজা শকুন্তলার কাছে ক্ষমা চাইলেন। দেবতার কৃপায় এতদিনে আবার মিলন হল।

অনুশীলনী

১। শকুন্তলার শিশুপুত্রকে বনের রাজা বলা হত কেন ?

২। রাজা দুষ্মন্ত ও তাঁর শিশুপুত্রের মিলনের দৃশ্যটি বর্ণনা কর।

৩। টীকা লেখ :—ইন্দ্রদেবের রথ, কশ্যপ, অপ্সরা।

লালুর পাঁঠাবলি

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



[অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভাগলপুরে মাতুলালয়ে থেকে পড়াশুনো করেন। রেঙ্গুনের সরকারী চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তিনি একান্ত ভাবে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলা হয়। তিনি ১৯৩৮ সালে পরলোকগমন করেন]।

পাড়ার মনোহর চাটুজ্যের বাড়ি কালীপুজো। দুপুর রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটল ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসল,—উপায়? এত রাতে ঘাতক মিলবে কোথায়? দেবীর পুজো পণ্ড হয়ে যায় যে! কে একজন বললে, পাঁঠা কাটতে পারে লালু। এমন অনেক সে কেটেছে। লোক দৌড়ল তার কাছে। লালু, ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসল, বললে—না।

না কি গো? দেবীর পুজোয় ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে। লালু বললে, হয় হোক গে। ছোটবেলায় ওকাজ করেছি, কিন্তু এখন আর করবো না।

যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগল, আর দশ-পনের মিনিট মাত্র সময়, তারপরে সব নষ্ট, সব শেষ। তখন

মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ওঁরা নিরুপায় হয়ে এসেছেন, না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও। সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নেই।

লালুকে দেখে চাটুজ্যে' মহাশয়ের ভাবনা ঘুচলো। সময় নেই—তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিঁদুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, বাড়িসুদ্ধ সকলের 'মা' 'মা' রবের প্রচণ্ড চীৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল, লালুর হাতের খড়্গ নিমেষে ঊর্ধ্বোত্থিত হয়েই সজোরে নামল, তারপরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তের ফোয়ারা কাল মাটি রাঙা করে দিলে। লালু ক্ষণকাল চোখ বুজে রইল। ঢাক, ঢোল, কাঁসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এলো। ক্রমশঃ যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল, আবার তার কপালে চড়ল সিঁদুর, গলায় দুললো রাঙা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ঙ্কর অন্তিম আবেদন, সেই বহুকণ্ঠের সম্মিলিত 'মা' 'মা' ধ্বনি। আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নিচে নেমে এলো—পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহ ভূমিতলে বারকয়েক হাত পা আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হলো।

ঢুলীরা উন্মাদের মতো ঢোল বাজাচ্ছে, উঠানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বহুলোকের কোলাহল। অকস্মাৎ লালু ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার দিয়ে বললে, আর পাঁঠা কই? বাড়ির কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দুটো করেই বলি হয়।

লালু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশ কণ্ঠে গর্জন করে উঠল, নেই পাঁঠা, সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে—দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাব ধরে নরবলি দেব—'মা' 'মা' 'জয় কালী'—বলেই একটা মস্ত লাফ

দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিক গিয়ে পড়ল। তার হাতের খাঁড়া তখন বন্ বন্ করে ঘুরছে। তখন যে কাণ্ড ঘটল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না! সবাই একসঙ্গে ছুটল সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় ভীষণ ঠেলাঠেলি হুড়োমুড়িতে সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়ছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কারো পায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে বেরুবার চেষ্টা করছে কিন্তু এসব মাত্র মুহূর্তের জন্য। তারপরেই সমস্ত ফাঁকা।

লালু গর্জে উঠল—মনোহর চাটুজ্যে কই? পুরুত গেল কোথায়?

পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে ঠাকুর-দালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা-ঢাকা দিয়েছেন। কিন্তু মনোহর চাটুজ্যের পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। লালু এগিয়ে একটা হাত চেপে ধরলে, বললে,—চল, হাড়িকাঠে গিয়ে গলা দেবে।

একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্যের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদো কাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন,—লালু! বাবা! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ আমি পাঁঠা নই, মানুষ! আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা।

—সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে—চল তোমাকে বলি দেব। মায়ের আদেশ!

চাটুজ্যে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—না বাবা, মায়ের আদেশ নয়—কখনো নয়—মা যে জগজ্জননী।

লালু বললে—জগজ্জননী—সে জ্ঞান আছে তোমার! আর দেবে পাঁঠাবলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে, বল?

চাটুজ্যে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কোনোদিন নয় বাবা, আর

কোনোদিন নয়, মায়ের সম্মুখে তিন সত্যি করছি, আজ থেকে আমার বাড়িতে বলি বন্ধ। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাব।

লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালালো কোথা দিয়ে! গুরুদেব। সে কই? এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুর দালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলায় ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠল। সরু ও মোটায় মিলিত সে শব্দ এমন অদ্ভুত ও হাস্যকর যে লালু আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে দুম করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ি ছেড়ে পালালো।

তখন করো বুঝতে বাকী রইল না খুন চাপাটাপা সব মিথ্যে, লালু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল।

সে যাই হউক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্যেবাড়ির কালীপুজোয় তখন থেকে পাঁঠাবলি উঠে গেল।

অনুশীলনী

১। চাটুজ্যেবাড়ির কালীপুজোয় পাঁঠাবলির বিবরণ দাও।

২। পাঁঠাবলির পর লালু কি করেছিল, সংক্ষেপে বল।

৩। লালু মায়ের পুজোয় বীভৎস বলিদান কিভাবে বন্ধ করেছিল?

৪। ব্যাখ্যা লেখ —

পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহ…স্থির হল।

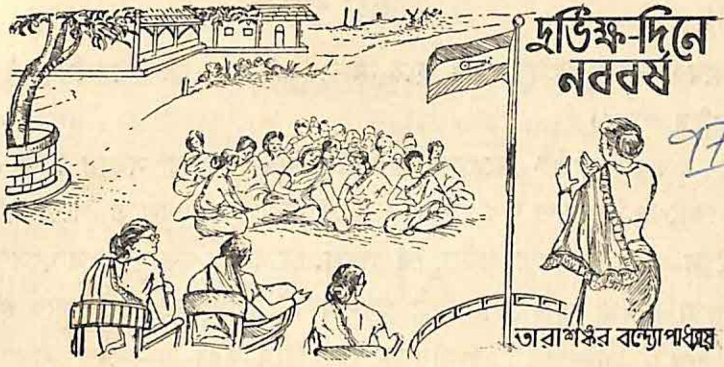
৫। শব্দার্থ লেখ :—কামার, পশু, উৎসর্গিত, আর্তকণ্ঠ, হুঙ্কার, স্তব্ধ।

৬। বাক্য রচনা কর :—

মাথায় হাত, মাথা কুটতে, নিরুপায়, নালিশ, কুশাসনে, তিন সত্যি।

দুর্ভিক্ষ-দিনে নববর্ষ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



[তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮—১৯৭১) বীরভূম জেলার লাভপুরের জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার সময় তিনি অসহযোগ আন্দোলন ও পরে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন, ফলে কিছুকাল কারারুদ্ধ থাকেন। তিনি রবীন্দ্রোত্তর যুগের সর্বাধিক জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক এমনকি চিত্রশিল্পেও তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। সাহিত্যের জন্য তিনি জ্ঞানপীঠ ও রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর রচিত 'কালিন্দী', ধাত্রী দেবতা', 'গণদেবতা', 'কবি', 'আরোগ্য নিকেতন', 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' প্রভৃতি সবিশেষ জনপ্রিয়। নিচের অংশটি তাঁর 'জনপদ' শীর্ষক উপন্যাসের অন্তর্গত]।

শান্তির স্কুলেরও আজ ছুটি। সে এখানে এসেছে দেড় বৎসর। সে এসেই এখানে মেয়েদের নিয়ে নববর্ষের উৎসব প্রবর্তন করেছে। স্কুলের মেয়েদের নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ ক'রে স্কুলে এসে ছোট্ট একটা সভা করে, গান হয় দু-তিনখানি। নিজে সে কিছু বলে। বলে, আজ নূতন বৎসর আরম্ভ হ'ল। আজ আমরা ভগবানকে প্রণাম করছি। তাঁর চরণে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের বল দেন। আমরা যেন সকল দুঃখকে জয় করতে পারি। তিনি যেন আমাদের প্রিয়জনকে রক্ষা করেন।—এমনই ধরনের কয়েকটি কথা। তারপর সে নিজেই গান করে, তার সঙ্গে যোগ দেয় কয়েকটি ছাত্রী। গানের

সঙ্গেই নববর্ষ-উৎসব শেষ হয়ে যায়, এর পর সে নিজে কিছু দান ক'রে থাকে।

আজকার এই তেরোশো একান্ন সালের নববর্ষের সভায় কিন্তু সে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা স্মরণ না ক'রে পারলে না। বলতে গিয়ে শান্তি যেন আবেগময়ী হয়ে উঠল, সে বললে, যে বৎসর গত হ'ল সে বৎসরের কথা আমরা কেউ কোন দিন ভুলব না। আমাদের দেশ উজাড় হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষের, মহামারীর মহামারণে মরণ আমাদের মা-বাপ, ভাই-বোন – আমাদের প্রাণের জনের মাথার খুলি নিয়ে গেণ্ডুয়া খেলে চ'লে গেল। তার জন্যে তেরোশো পঞ্চাশকে যেন আমরা দায়ী না করি। তেরোশো পঞ্চাশকে করজোড়ে প্রণাম করি। তোমরাও তাকে প্রণতি জানাও। তেরোশো পঞ্চাশ আমাদের জ্ঞানদাতা, গুরু। সে আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেল, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেল, স্বার্থপর অর্থলোলুপ হৃদয়হীন মানুষের দল, যারা জগতের দৃষ্টিতে সভ্যতার উচ্চশিখরে ব'সে আছে, যারা মুখে বলে—আমরাই তোমাদের মঙ্গলের বিধাতা, তাদেরই স্বার্থের জন্য এ দুর্ভিক্ষ, এ মহামারী তারাই সৃষ্টি করলে। লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুখের অন্নে বঞ্চিত ক'রে তারা দৃক্‌পাতহীন হয়ে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি করলে, আরোগ্যের ওষুধে বঞ্চিত ক'রে তারা ভ'রে তুললে আপনাদের সঞ্চয়, করে তুললে আপনাদের শক্তিমান। তেরোশো পঞ্চাশের মূর্তি ধ'রে মহাকাল আমাদের দেখিয়ে দিয়ে গেল, বুঝিয়ে দিয়ে গেল মহাসত্য। আমরা দেখলাম—

"প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।"

তার কণ্ঠস্বর আবেগে থরথর ক'রে কাঁপছিল।

আবেগের আবেদনটুকু ছিল গভীর, আগুনের উত্তাপের মত তার

আবেগের উত্তাপের স্পর্শ মেয়েগুলির অন্তর পর্যন্ত গিয়ে স্পর্শ করেছিল; বিস্ফারিত প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে দিদিমণির মুখের দিকে চেয়ে একাগ্র হয়ে শুনছিল। অন্য শিক্ষয়িত্রী কয়েকজন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, তার মনের এই আগুন-ধরা অবস্থা দেখে।

কবিতার পর আর অল্প কয়েকটি কথা ব'লে শান্তি তার বক্তব্য শেষ করলে। বলতে গিয়ে তার চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠল—বললে, ভগবান যদি বলেন, যদি এই মুহূর্তে দৈববাণীও হয়, তিনি তাদের ক্ষমা করেছেন, তাদের তিনি ভালবাসেন, তবু আমরা তাদের ক্ষমা করব না। কখনও ক্ষমা করতে পারব না।

শান্তি কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর গাঢ়স্বরে বললে, বক্তব্য আমার শেষ হয়েছে। শেষকালে, শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

"দেশ-দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আনো, তব দক্ষিণ পাণি,
তব শুভ সঙ্গীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল করো কলঙ্কশূন্য।"

অনুশীলনী

১। তেরোশো পঞ্চাশ বঙ্গাব্দ বাঙালী-জীবনে কেন স্মরণীয় হয়ে রয়েছে? এর কথা বলতে গিয়ে শান্তি আবেগময়ী ভাষায় কি বলেছিলেন?

২। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সৃষ্টির জন্য শান্তি কাদের দায়ী করেছেন?

৩। শব্দার্থ লেখ:—প্রবর্তন, প্রদক্ষিণ, বিতরণ, দৈনন্দিন, মন্বন্তর, আবেগময়ী, গেঙুয়া, উচ্চশিখরে, বিস্ফারিত।

৪। কোন্‌টি কোন পদ লেখ:—দেড়, উৎসব, প্রার্থনা, জয়, তিনি, মূর্তি।

৫। বাক্য রচনা কর:—ছুটি, উদ্ধার, দৃকপাতহীন, উচ্চশিখরে, আগুন-ধরা, প্রখর।



[পরলোকগত কেদারেশ্বর সেন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। গুপ্ত বিপ্লবের গুরুদায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য পাঠ ও রচনাও কিছু কিছু করেছেন]।

(প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগ। বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির উপর পুলিসের ব্যাপক আক্রমণ চলছিল। সমিতির অন্যতম সেরা ছেলে নলিনী বাগচী আই-এস-সি পরীক্ষায় ২০ টাকা বৃত্তি পেয়ে বহরমপুর কলেজে পড়ছিলেন। দলের নির্দেশে আত্মগোপন করে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে বিহারী কুলি সেজে কলকাতায় এলেন সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেখান থেকে বিশেষ অসুস্থ হয়ে ঢাকার কলতা বাজারে)।

দশদিন ধরিয়া জীবন-মরণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নলিনী বাঁচিয়া উঠিলেন। এই সময়ে তারিণী মজুমদারও উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের নানা স্থান ঘুরিয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন। তিনিই নলিনীকে সঙ্গে লইয়া ঢাকায় গেলেন। স্থির হইল, পূর্ববঙ্গের সংগঠন-ভার লইয়া নলিনী ঢাকায় অবস্থান করিবেন। কলতা বাজারে একটা বাসা ভাড়া করা হইল হরিচৈতন্যের নামে। এই বাসায়ই তিন বিপ্লবী কর্মী থাকিতেন।

শেষ রাত্রিতে (১৫ জুন ১৯১৮) উঠিয়া স্টার (পুলিস এড়িয়ে আত্মগোপন-কালে তারিণী মজুমদারের ছদ্মনাম) অন্যদিনের মত

সেদিনও ব্যায়াম করিতেছিলেন। হরিচৈতন্য তখনও নিদ্রিত। নলিনী বাগচী প্রাতঃকৃত্যের জন্য উঠিয়াছিলেন। ব্যায়াম করিতে করিতে স্টার হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি বাড়ির দেওয়াল টপকাইয়া ভিতরে আসিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিল। তিনি গৃহাভ্যন্তর হইতে গুলীভরা মশার পিস্তল লইয়া আসিয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। মুহূর্ত মধ্যে সশস্ত্র পুলিসদলও ভিতরে প্রবেশ করিল। সকলের আগে ছিল গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর প্রফুল্ল বিশ্বাস। স্টারের প্রথম গুলী তাহার কপালে লাগিল। স্টার যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন সেখান হইতে একটু দূরে প্রফুল্ল বিশ্বাস পড়িয়া গেল। প্রকৃত পক্ষে প্রফুল্ল বিশ্বাসের আঘাত বেশী ছিল না। গুলী তাহার কপাল ভেদ করে নাই, শুধু ত্বকের কিছুটা অংশ আঁচড়াইয়া গিয়াছিল ; কিন্তু সে ভয় পাইয়া মাটিতে শুইয়া পড়ে। যতক্ষণ সংঘর্ষ চলিয়াছিল সে আর উঠে নাই। এই অবস্থায় সে বাঁচিয়া যায়। এদিকে যতক্ষণ গুলী ছিল স্টার ততক্ষণ গুলী চালাইয়া যান। মৃত্যুপণ করিয়া তিনি সংগ্রাম করেন। স্টারের দ্বিতীয় গুলীতেই গোয়েন্দা ইন-স্পেক্টার বসন্ত মুখার্জি আহত হয়। তাহার আঘাত এত গুরুতর ছিল যে হাসপাতালে কয়েকদিন পর্যন্ত তাহার অজ্ঞান অবস্থায় কাটে। চিকিৎসকগণও তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পুলিস দল ছিল সংখ্যায় বহু। বাধা পাইয়াও তাহারা দলবদ্ধভাবেই অগ্রসর হইল। তাহারা স্টারের মশার পিস্তলের গুলীর প্রত্যুত্তরে রাইফেল হইতে অনবরত গুলী করিতেছিল। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত স্টার সংগ্রাম করেন। তাঁহাকে পুলিস জীবিত অবস্থায় পায় নাই। তাঁহার মৃতদেহ যখন পুলিসের হস্তগত হয় তখন দেহের বহুস্থান গুলীবিদ্ধ দেখা যায়।

স্টার পুলিসের সম্মুখীন হইয়া একাকীই সংগ্রাম আরম্ভ করেন। নলিনী বাগচী পায়খানায় বসিয়াই বুঝিতে পারেন, তাঁহারা আক্রান্ত।

মুহূর্তমধ্যে প্রস্তুত হইয়া তিনি স্টারের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। এই সময়ে পুলিসদল একযোগে মুহুর্মুহুঃ গুলী চালাইতেছিল। নলিনী বাগচীর পক্ষে সে গুলীবৃষ্টির মধ্যে বেশিক্ষণ টিকিয়া থাকা সম্ভব হয় নাই। তিনি গুলীবিদ্ধ হইয়া পড়িয়া যান। তাঁহার গুলীবিদ্ধ মুমূর্ষু দেহ পুলিসের হস্তগত হয়। হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পরিচয় পাইবার জন্য পুলিস বহু চেষ্টা করে। কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়াও আপনার কোন পরিচয় জানাইয়া যাইবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বিদ্রোহী বীরের ছিল না। মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার মুখে একটি মাত্র কথা—'Don't disturb me, Let me die peacefully.' ('বিরক্ত কর না, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।')। গ্রেপ্তারের কয়েকঘণ্টা পরেই নলিনী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার গুলীবিদ্ধ দেহ পুলিসদলই সৎকার করে। নলিনী ও স্টার ১৯০৮ সাল হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত বিপ্লবী সংগ্রামের শেষ শহীদ।

অনুশীলনী

১। কলতা বাজারে পুলিসের সঙ্গে বাঙালী বিপ্লবীদের সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। নলিনী বাগচী কে ছিলেন? মৃত্যুকালে তিনি কি বলেছিলেন? তাঁর কথা ও কার্যকলাপ থেকে তাঁর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা হয়।

৩। শব্দার্থ লেখ :—

সংগঠন, প্রাতঃকৃত্য, মশার পিস্তল, সংঘর্ষ, প্রত্যুত্তরে।

৪। বাক্য রচনা কর :—

ধরিয়া, এড়িয়ে, আঁচড়াইয়া, মুহুর্মুহুঃ, সৎকার।

৫। বিপরীত শব্দ লেখ :—

আত্মগোপন, সশস্ত্র, প্রস্তুত, গুরুতর, জীবিত।



[স্যার আশুতোষের তৃতীয় পুত্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৫ –) ইতিহাসের কৃতী ছাত্র ও আইনজ্ঞ হলেও বরাবরই সাহিত্যানুরাগী। তাঁর পরিচালিত সাহিত্যপত্র 'বঙ্গবাণী'তেই শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ভ্রমণকাহিনীর ('মণিমহেশ') জন্য তিনি সাহিত্যে আকাদমী পুরস্কার (১৯৭১) লাভ করেন। তিনি চিরকুমার। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নিজস্ব আশ্রমে থাকেন]।

গোসাইকুণ্ড নামটি প্রথম শুনি চল্লিশ বছর আগে। সেই আমার প্রথম নেপাল যাওয়াও।

সে সময়ে কাঠমাণ্ডু কলেজে কয়েকজন বাঙালী অধ্যাপক ছিলেন। হিমালয়ে তাঁদের বাস, তাই হিমালয়ের প্রতি ভালবাসাও। তাঁদের অগ্রণী ছিলেন সুধীরবাবু। তিনিই উৎসাহ জাগান, হিমালয় দেখলেন কই ? প্রকৃত পরিচয় করতে চান তো চলে যান অন্ততঃ গোসাইকুণ্ডে। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ঘুরে আসতে পারবেন। এমন কিছু দূরদেশ নয়। তবে, হ্যাঁ—দুর্গমতা আছে। কাঠমাণ্ডুর উত্তর অঞ্চলে যে বিরাট পাহাড়ের সারি, তারই মধ্যে লাংটন হিমল রেঞ্জ। ওখানকার বরফের পাহাড় এখান থেকেও দেখা যায়। তারই দক্ষিণ কোলে গোসাইকুণ্ডের পাহাড়। চৌদ্দ-পনেরো হাজার ফুট উঁচু পাহাড় ডিঙিয়ে যাওয়া।

গোসাঁইকুণ্ডে পৌঁছে দেখবেন, বরফের পাহাড়ে অপূর্ব হ্রদ। একটা নয়, সারি সারি কয়েকটাই। হ্রদের পর হ্রদের সোপান বেয়ে ত্রিশূলী নদীর এক ধারা নেমে আসে। দেখে আস্থন।

জীপ সময় মতই আসে। তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। ঘনঘটা অন্ধকার। একটানা বৃষ্টিপাতের নির্মম ঝমঝম ধ্বনি। ভাবি যাত্রার প্রারম্ভেই এ-যেন পার্বত্য প্রকৃতির দপ্তরে পরীক্ষা গ্রহণের ঘণ্টার সংকেত।

বর্ষাতি গায়ে দুজনে বৃষ্টির কশাঘাতের সম্মুখীন হই। জীপের মধ্যে মালপত্র রেখে উঠে বসি। ভয় নয়, ভাবনা নয়, মনে কোন বিরক্তিভাবও নয়। দুজনেরই হৃদয়ভরা অসীম আনন্দ। উদ্বেল উৎসাহ। হিমালয়ের পথে যাত্রাপথের এসব তুচ্ছ বাধাবিঘ্ন—সে তো থাকেই। গোলাপ তুলতে কাঁটা বেঁধে, পদ্ম তুলতে কাদা লাগে। বিশ্বাস রাখি, মেঘ আসে, আঁধার কাটে। আঁধারের বুক চিরেই তো আলোর খেলা।

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সাল। ৫-১০এ যাত্রা শুরু। বোধনাথের পথ ভাঙা-চোরা। তায় বৃষ্টি-বাদল। তাই মাইল চারেক মাত্র দূর হলেও পৌঁছুতে আধঘণ্টা লাগে।

বৃষ্টি থামে। সকালের আলো ফোটে! প্রকৃতি দেবী যেন প্রাতঃস্নান সেরে কষায় বস্ত্র ধারণ করেন, স্মিত বদনে আশিস জানান।

জীপ ছুটে চলে। বোধনাথ ছাড়িয়ে গোকর্ণ, তারপর সুন্দরীজল। ৭-১৫তে পৌঁছে যাই। শহর থেকে মাত্র আট-ন' মাইল পথ। সুন্দরীজল প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে। কাঠমাণ্ডুর সমতল উপত্যকা এই দিকে এখানেই শেষ হয়।

সমুখেই হিমালয়ের শিউপুরী গিরিশ্রেণী। পথের পাশেই বাগমতী নদী। পর্বতকারা থেকে মুক্তি পেয়ে সমতলে নামে। পাহাড়ের

কিছু উপরে নদীর জলপথের গতিরোধ করে জলাধারের সৃষ্টি হয়েছে। এটাই কাঠমাণ্ডু শহরের জল-সরবরাহের ব্যবস্থা।

আবার পথ চলা। অবারিত দৃষ্টি চলে বহুদূর। দূরে আঁকাবাঁকা শীর্ণকায়া নদীর রেখা। অদূরে সমুখে দিগন্তজোড়া পাহাড়ের চূড়া, আকাশে মাথা ঠেকিয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে।

এতখানি চড়াই ভেঙে দূরত্ব যেন কিছুই কমেনি। অথচ হিমালয়ের অদ্ভুত খেলা। নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকেও কেবলি যেন দূরে সরে যায়। এগিয়ে গেলেও কাছে আসে না, ধরা দেয় না। তবুও ধরতেই হবে। উৎসাহে হাঁটতে থাকি। চড়াই-চড়াই।

হঠাৎ দেখি পৌঁছে গেছি পাহাড়ের মাথায়।···নিচে হ্রদ দেখা যায়।

সোৎসাহে নেমে চলি হ্রদের দিকে। গোসাইকুণ্ড এখনও কিছু দূরে। পাহাড়ের এ অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরে সারি সারি একাধিক হ্রদ যেন নীলপদ্মের মালা।

হ্রদগুলির স্বতন্ত্র নামও আছে। সূর্যকুণ্ড, সরস্বতীকুণ্ড, রক্তকুণ্ড, দুধকুণ্ড, নাগকুণ্ড, ভৈরবকুণ্ড ইত্যাদি। চতুর্থ হ্রদটিই সর্বপ্রধান—গোসাইকুণ্ড।

অনুশীলনী

১। গোসাঁইকুণ্ড কোন স্থানের নাম? কুণ্ড বলতে কি বোঝায়?

২। গোসাঁইকুণ্ড যাবার পথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

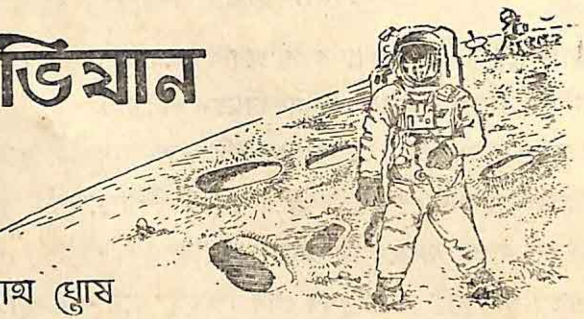
৩। ব্যাখ্যা লেখ :—গোলাপ তুলতে ··· খেলা।

৪। শব্দার্থ লেখ :—অগ্রণী, দুর্গমতা, কশাঘাত, উদ্বেল, দিগন্তজোড়া।

৫। কোনটি কোন পদ লেখ :—ডিঙিয়ে, অপূর্ব, ঝমঝম, সংকেত, চিরে, কষায়, আশিস।

৬। বিপরীত শব্দ লেখ :—অসীম, আঁধার, মুক্তি, সমতল, আঁকাবাঁকা, শীর্ণকায়া, নিশ্চল, চড়াই।

চন্দ্রাভিযান



মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ

[মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের জন্য দীর্ঘ কারাবাসের পর বৃত্তি হিসাবে সাংবাদিকতা বেছে নেন। প্রথম জীবনে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। সাংবাদিক জীবনে কিছু জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন। বর্তমানে তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক। এই নিবন্ধে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সর্বাধিক বিস্ময়কর কীর্তি চাঁদে মানুষের পদচারণার বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হয়েছে]।

গ্রহগুলি রাত্রির আকাশে যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। গ্রহান্তরে গিয়ে তার রহস্য উন্মোচনের অভিলাষ বিজ্ঞানীদের জয়-যাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে চলছিল। অবশেষে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ অক্টোবর একটি রুশ মহাকাশযান শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল। পৃথিবী থেকে প্রায় হাজার মাইল উঁচুতে কুকুর নিয়ে আর একটি মহাকাশযান পৃথিবী প্রদক্ষিণ করল এর কিছুকাল পরেই।

সোভিয়েট রাশিয়া তখনকার বিচারে যেন অসাধ্য সাধন করল। নবাবিষ্কৃত আণবিক শক্তি-চালিত রকেটের সাহায্যে ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরিত সোভিয়েট মহাকাশযান চন্দ্র পরিক্রমা করে চাঁদের ওপিঠে, অর্থাৎ মর্ত্যলোকের কাছে যে দিকটা চিরদিন অদৃশ্য—তার ছবি তুলে পাঠিয়ে দিলে। চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবীর উৎপত্তিকালেই প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা থেকে একটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল—সেটাই চাঁদ হয়ে পৃথিবীকে

প্রদক্ষিণ করছে। অন্য মতে, চাঁদ পৃথিবীর প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গলেরই অংশ—পৃথিবী পরে তাকে বেকায়দায় পেয়ে, পাকড়াও করে ফেলেছে। তোমরা জান বোধ হয়, সূর্যের মত সুস্থির তারকাকে যারা প্রদক্ষিণ করে তারা হল গ্রহ—যেমন মঙ্গল, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি ও আমাদের পৃথিবী ইত্যাদি। আর যারা গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে তারা হল উপগ্রহ। বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যা নয়, মঙ্গলের দুই। ভূপৃষ্ঠের উপরে প্রায় ৫০ মাইল ক্রমক্ষীয়মাণ বায়ুমণ্ডল জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও ক্ষুদ্রায়তন চন্দ্রে বায়ুমণ্ডল নেই বললেই হয়। আর সেখানে জলও বিরল। ফলে চন্দ্রে প্রাণীর অস্তিত্ব অসম্ভব। চন্দ্রলোক নিথর, সম্পূর্ণ নির্জন অঞ্চল।

সভ্যতার আদি যুগ থেকেই চাঁদ পৃথিবীর মানুষকে মুগ্ধ করে এসেছে কবির কল্পনার সঙ্গে মিশেছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর সাধনা; কিন্তু তবুও চাঁদ ছিল যেন এক মায়াপুরী। অবশেষে তাঁকে ধরা দিতেই হল—যেমনটি ধরা দিয়েছিল রূপকথার অভিযাত্রী রাজপুত্রের কাছে পাতালপুরীর বন্দিনী কন্যা। প্রথমে সোভিয়েট নভোচারী য়ুরি গ্যাগারিন প্রমুখ চাঁদের কাছে অনেক দূর গিয়ে সেই ঘুমের দেশে উঁকি দিয়ে এলেন, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে। এযুগের নারীরাও পিছিয়ে থাকবার নয়। কিছুদিন পরেই সোভিয়েট তরুণী ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা মহাশূন্য পরিক্রমা সম্পন্ন করে এলেন।

মানুষের সভ্যতার জয়যাত্রার ইতিহাসে ২১ জুলাই ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ এক বিশেষ স্মরণীয় দিন। এর আগে সোভিয়েট ও মার্কিন মহাকাশযান যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদের দেশে পাঠান হয়েছিল। তারা সেখান থেকে পৃথিবীতে চিত্র ও তথ্যাদি পাঠিয়েছে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মনুষ্যবাহী মার্কিন মহাকাশযান চাঁদের দ্বারদেশ থেকে ফিরে এল, আড়াই লক্ষাধিক মাইল পথ পরিক্রমা সেরে।

কিন্তু ২১ জুলাই ঘটল শতাব্দীব্যাপী সাধনার সার্থক সিদ্ধি। মার্কিন মহাকাশচারী অর্মস্ট্রং ও অলড্রিন মহাকাশযান থেকে ভেলায় চড়ে চাঁদে নামলেন। যা ছিল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে তা এল নাগালে। চন্দ্রভূমিতে পড়ল মানুষের পদচিহ্ন। আর্মস্ট্রং চাঁদে বেশ কিছুক্ষণ পদচারণা করেন। আবহাওয়াহীন চাঁদে পৃথিবীর প্রায় ছ'গুণ জোরে হাঁটা যায়। মার্কিন অভিযাত্রী সাগ্রহে অপেক্ষমাণ বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বাণী পাঠালেন বেতারবীক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে—'ক্ষুদ্র পদক্ষেপ, কিন্তু মানবজাতির ইতিহাসে এক বিরাট অগ্রগতি।' এর পর কেপ কেনেডিস্থিত মার্কিন চন্দ্র-গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে চাঁদে আরও কয়েকবার মানুষ নামান হল।

নভোচারীরা চাঁদ থেকে অনেক কিছু নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন। চাঁদ থেকে আনা একটি পাথর কলকাতার ইডেন উদ্যানের এক প্রদর্শনীতে কিছুদিন রাখা হয়েছিল—তোমরা দেখেছ কি? এই শিলাটির বয়স নাকি সাড়ে তিন হাজার কোটি বছর। বিজ্ঞানীরা এখন এইসব নিদর্শন খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন—চাঁদ ও পৃথিবীর জন্মকথা সঠিক ভাবে জানবার জন্যে। পৃথিবী থেকে কয়েকশ' বিজ্ঞানী পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এই অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। মার্কিন মহাকাশযান এ্যাপোলো-১৩ যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য চাঁদে নামতে পারল না। যানটিকে অভিযাত্রী সমেত প্রশান্ত মহাসাগর-বক্ষে ফিরিয়ে আনা হল। সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কিন্তু নভোচারীদের মাটিতে ফিরিয়ে আনতে পারেন, সমুদ্রে নামাতে হয় না। তাই রুশ ও মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রচেষ্টায় মহাকাশ মহড়া চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মহাকাশ পরিক্রমার ব্যয় আমাদের প্রায় কল্পনাতীত। রুশ বিজ্ঞানী বললেন, তাঁরা অমূল্য জীবন বিপন্ন করে লোক না পাঠিয়ে

অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে মহাকাশযানে সন্নিবিষ্ট যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠের নমুনা সংগ্রহ করবেন, করলেনও। মার্কিন মুলুকের বক্তব্য —হাঁ, এক একটা অভিযানে আনুমানিক ১৭ হাজার কোটি টাকা খরচ হয় বটে, কিন্তু আমেরিকার অধিবাসীরা বছরে স্রেফ সিগারেট খেয়ে যে টাকা ধোঁয়ায় উড়িয়ে দেয়—একটি চন্দ্রাভিযানের ব্যয় তার তিন ভাগের এক ভাগ। আর চন্দ্রাভিযানের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে মানুষ সৌর জগতের গ্রহাদির সৃষ্টিরহস্য জানতে পারবে এবং শীগ্‌গীরই গ্রহান্তরে পাড়ি দেবে—এমন আশা করা যায় না কি ?

অনুশীলনী

১। ধাপে ধাপে কিভাবে মানুষ চাঁদে গিয়ে পৌছাল, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। ২১ জুলাই ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ 'সভ্যতার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন' কেন ?

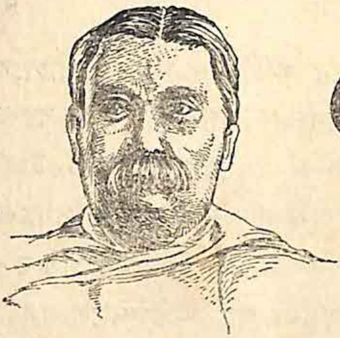
৩। মার্কিন ও রুশ চন্দ্রাভিযানের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?

৪। বিপুল ব্যয়বহুল চন্দ্রাভিযানের সার্থকতা কোথায় ?

৫। চাঁদকে কেন পৃথিবীর উপগ্রহ বলা হয় ? চাঁদের বৈশিষ্ট্য কি কি ? পৃথিবীর সঙ্গে পার্থক্যের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৬। ব্যাখ্যা লেখ :— (ক) কবির কল্পনার……বন্দিনী কন্যা।
(খ) 'ক্ষুদ্র পদক্ষেপ……অগ্রগতি।'

৭। শব্দার্থ লেখ :—উন্মোচনের, প্রদক্ষিণ, রকেট, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা, নভোচারী, ক্রমক্ষীয়মাণ সৌর জগৎ, বেতারবীক্ষণযন্ত্র।



আশুতোষ

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

[ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তরুণ বয়সে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানে করে দীর্ঘদিন রাজবন্দী ছিলেন। সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা ও চলচ্চিত্র জগতে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। পত্র-পত্রিকায় নানা ধরনের রচনা, বিশেষ করে প্রবন্ধ লিখে থাকেন]।

পাঁচ বছরের এক শিশু একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে বলল, 'আমি আর স্কুলে যাব না, বাবা।'

বিস্মিত পিতা পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক ঘণ্টা আগেও স্কুলে যাবার আনন্দে অধীর যে শিশুটির চোখে-মুখে পিতা এক গভীর ঔৎসুক্য ও বিরাট সম্ভাবনার ছবি ফুটে উঠতে দেখেছিলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই তা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে অবজ্ঞা ও অনীহার ভাব—পিতা ক্ষুব্ধ ও চিন্তিত হলেন।

'কেন, বাবা ?' প্রশ্ন করলেন পিতা।

'ও তো স্কুল নয়, যাত্রাগানের আখড়া। ওখানে কি পড়া যায় ?'

বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বালকের এই তীব্র অভিযোগ এক কথায় উড়িয়ে দিয়ে তাকে আবার স্কুলে পাঠাতে পারতেন পিতা। কিন্তু সে মনোভাবে চালিত হবার মানুষ ছিলেন না ভবানীপুরের নামজাদা চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

এহেন অবাঞ্ছিত পরিবেশের প্রতি শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গঙ্গাপ্রসাদ তার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করলেন; সেই সঙ্গে পুত্র আশুতোষকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আবার স্কুলে পাঠালেন।

মহীরূহের সম্ভাবনা প্রথম কিশলয়ের বুকেই অঙ্কিত থাকে। বিদ্যালয়ে প্রথম পদক্ষেপেই পঠন-পাঠনের পরিবেশ ও শিক্ষাক্ষেত্রে অব্যবস্থা সম্পর্কে শিশু আশুতোষের যে সচেতনতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, পরিণত বয়সে শিক্ষা-সংস্কারে তাঁর প্রবল সংগ্রাম ও সাফল্যের মাধ্যমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থায় তা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে॥

মুখোপাধ্যায় পরিবারের আদি নিবাস ছিল হুগলি জেলার জিরাট-বলাগড়ে। সেখান থেকে এসে তাঁরা কলকাতার মলঙ্গা লেনে বসবাস শুরু করেন। এখানেই ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ জুন আশুতোষের জন্ম হয়।

ভবানীপুর কাঁসারিপাড়ার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হরিলাল চট্টো-পাধ্যায়ের কন্যা জগত্তারিণী দেবী ছিলেন আশুতোষের জননী। তাঁর নিষ্ঠা ও ধর্মপ্রাণতা আশুতোষের চরিত্র গঠনে প্রভূত সহায়ক হয়। বিদ্যাসাগর জননীর মত তিনিও ছিলেন পুত্রের জীবনপথের ধ্রুবতারা। বড়লাট লর্ড কার্জন ইংরেজী শিক্ষায় ভারতীয়দের মধ্যে উন্নতির দৃষ্টান্ত স্বদেশবাসীর সামনে হাজির করানোর উদ্দেশ্যে আশুতোষকে বিলেত পাঠাতে চাইলে বড়লাটের প্রস্তাবের উত্তরে তিনি সুস্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, 'বিলেত যাত্রায় জননীর সম্মতি নেই।' জবাবে লর্ড কার্জন সদম্ভে বললেন, 'আপনার মাকে বুঝিয়ে বলবেন, 'ভারতের প্রবল প্রতাপশালী বড়লাট বাহাদুর আপনাকে বিলেত যেতে আদেশ করছেন।' সমুচিত দৃঢ়তায় আশুতোষ জবাব দিলেন, 'কেবল মাতাই আমাকে আদেশ করতে পারেন; ভারতের বড়লাট কেন, গোটা পৃথিবীর অধীশ্বরের চাইতেও তিনি আমার কাছে বড়। তাঁর সম্মতি না পেলে সম্রাটের আদেশও আমার কাছে নগণ্য।'

মাতার ন্যায় মাতৃভাষা বাংলা ও বাঙালীর মর্যাদা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য আশুতোষ আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

স্যাডলার কমিশনের সদস্য রূপে মহীশূর গেলে, মহীশূর রাজের এক ভোজসভায় তিনি নিমন্ত্রিত হলেন। রাজার একান্ত সচিব আশুতোষের জন্য গাড়ি নিয়ে এসে দেখলেন যে, তিনি ধুতি-চাদরে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুত হয়েছেন। বিস্মিত একান্ত সচিব বললেন, 'দরবারের রীতি অনুযায়ী আপনাকে চাপকান ও পাগড়ি সজ্জিত হয়ে যেতে হবে।

উত্তরে আশুতোষ ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, 'আপনাদের দরবারের রীতি রক্ষার খাতিরে আমি আমার জাতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করতে পারব না।' আশুতোষের অনুপস্থিতির কারণ জানতে পেরে, তাঁর এই মহান জাতীয়তাবোধে বিমুগ্ধ মহারাজা, তখনই যুবরাজকে তাঁর কাছে বার বার ক্ষমা চেয়ে তাঁকে নিয়ে আসতে পাঠালেন।

মাতৃভক্তি, তেজস্বিতা ও স্বাজাত্যাভিমানে আশুতোষের চরিত্র, বলাবাহুল্য, আর একজন বাঙালীর মহত্ত্বে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ইনি ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর। 'কালো আদমী' বলে কোন ক্ষমতাগর্বী ইংরেজের বাঙালীর প্রতি অসদাচরণের মত্ততাকে বিদ্যাসাগরের মত আশুতোষও চূর্ণ করেছিলেন। আশুতোষ একদিন রেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক কামরায় কলকাতা আসছিলেন। অনেক রাত হয়েছে। আশুতোষের তন্দ্রার ভাব এসেছিল। পথিমধ্যে, একটা স্টেশন থেকে, এক পদস্থ শ্বেতাঙ্গ সৈনিক সে কামরায় উঠলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এত রাত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় দ্বিতীয় কোন যাত্রী থাকবেন না। তিনি স্বচ্ছন্দে একাকী রাত কাটাতে পারবেন। কিন্তু একি! কামরার মধ্যে তাকাতেই তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। খালি তো নয়ই, সহযাত্রী ব্যক্তির চেহারায় তাঁকে ভারতীয় হিসেবেও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার অনুপযুক্ত বলেই মনে হয়। আসলে বিরাট গোঁফ-শোভিত ধুতি-চাদর পরিহিত বিপুলকায় আশুতোষ বেঞ্চির নিচে এক

জোড়া নাগরাই রেখে নগ্নপদে ঝিমুচ্ছিলেন ; সাহেবকে দেখে সসম্ভ্রমে উঠে বসা দূরের কথা, একবার তাকিয়েও, সমান ঔদাসীন্যে, নিদ্রার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সাহেবের মেজাজ পঞ্চমে চড়ল। জিনিসপত্র গোছানোর সময় লাথি দিয়ে আশুতোষের নাগরাই গাড়ির বাইরে ফেলে দিলেন। কিছুক্ষণ পর আশুতোষ তাঁর জুতো না দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। নিদ্রার প্রস্তুতিতে সাহেব তাঁর কোটটি খুলে ঝুলিয়ে রাখলে আশুতোষ উঠে গিয়ে কোটটি গাড়ির বাইরে ছুঁড়ে ফেললেন। মিলিটারী সাহেব রাগে ফেটে পড়লেন এবং অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আশুতোষের কাছে একাজের কৈফিয়ৎ দাবি করলেন। জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে আশুতোষ উত্তর দিলেন, 'আমার জুতোজোড়াকে খুঁজে আনবার জন্য তোমার কোটটিকে পাঠিয়ে দিয়েছি।' আশুতোষের দৃঢ় ও দৃপ্ত কণ্ঠস্বরে সাহেবের লম্ফঝম্প বন্ধ হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, এ বাঙালীর চরিত্র কিছুটা অনন্যসাধারণ।

অনুশীলনী

১। আশুতোষের মাতৃভক্তির একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দাও।

২। বাঙালী ও ভারতবাসী রূপে আশুতোষ কিভাবে আত্মমর্যাদা রক্ষা-করেছেন তার উল্লেখ কর।

৩। ব্যাখ্যা লেখ :—মহীরূহের……অঙ্কিত থাকে।

৪। শব্দার্থ লেখ :—অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অনীহা, ক্ষুব্ধ, প্রতিবিধানে, মহীরূহ, ধর্মপ্রাণতা, নগণ্য, ঔদাসীন্যে, অনন্যসাধারণ।

৫। বিপরীত শব্দ লেখ :—গভীর, অবজ্ঞা, অবাঞ্ছিত, সচেতনতা, হাজির, গম্ভীর, মহত্ত্ব, অনুপযুক্ত।



[প্রাচীন ধারার কবিওয়ালা ঐতিহ্যের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ প্রয়োগে সমসাময়িক শহুরে জীবন চিত্রিত করেছেন। তিনি পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন এদেশবাসীর মনে স্বদেশানুরাগ জাগাতে প্রয়াসী হন। তাই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত প্রিয় কবি ছিলেন]।

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
সে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে॥
ভূমিতে করিয়ে বাস, ঘুমেতে পুরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কতকাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ॥

শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার।
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাহি আর।
সুধাকরে কত সুধা দূর করে তৃষ্ণাক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার॥
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্যধর্ম পথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ॥

অনুশীলনী

১। 'স্বদেশ' কবিতার ভাবার্থ লেখ।
২। ব্যাখ্যা লেখ :—(ক) শিবের……স্বদেশ তোমার।
(খ) সুধাকরে……শুভ সমাচার॥
৩। টীকা লেখ :—বিদেশের ঠাকুর, শাস্ত্র, মাতৃভাষা।
৪। শব্দার্থ লেখ :—বিভাবরী, শিবপূর্ণ, সমাচার, চিত্ত-পটে, বিতরণ।
৫। বিপরীত শব্দ লেখ :—প্রিয়, সুধা, শুভ, মেলিয়া।
৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—(ক) স্বদেশের—সমাচার॥ (খ) চল—পথে।

বঙ্গভূমির প্রতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) যশোরের অন্তর্গত সাগরদাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি বেশী বয়সে বাংলা সাহিত্য রচনা শুরু করেও সাত বছরের মধ্যেই তার বিভিন্ন শাখায় কৃতিত্বের নিদর্শন রাখেন। তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য, বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রভৃতির প্রবর্তক। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। মেঘনাদবধ কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ গৌড়জনের নিরবধি সুধাপানের পাত্র]।

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।
প্রবাসে, দৈবের বশে,
জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে,— নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হ্রদে!
সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে,

মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন ;—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যামা জন্মদে !
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শরদে !

অনুশীলনী

১। কবি বঙ্গভূমির প্রতি কি প্রার্থনা জানিয়েছেন ?

২। কবিতাটির সারাংশ নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

৩। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—(ক) সাধিতে—সাধ, (খ) নাহি,—ডরি শমনে। (গ) পড়িলে—হ্রদে ! (ঘ) তবে—দয়া কর। (ঙ) ফুটি—স্মৃতি-জলে,

৪। অর্থ লেখ :—মিনতি, তামরস, নীর, শমন, মানস।

৫। গদ্যরূপ দাও :—সাধিতে, পরমাদ, সেবে, যাচিব, আশ।

৬। ব্যাখ্যা লেখ :—

(ক) প্রবাসে দৈবের বশে······তাহে।

(খ) চিরস্থির কবে নীর······জীবন নদে ?

(গ) ফুটি যেন······কি শরদে !

জীবন-সঙ্গীত



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) হুগলি জেলার অধিবাসী। ওকালতি তাঁর পেশা হলেও তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। তাঁর কবিতায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের সঙ্গে মিলেছে দেশাত্মবোধ। তাঁর 'বৃত্র-সংহার' মহা-কাব্যটি মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সঙ্গে তুলনীয়]।

ব'লো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন।
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার
—ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন।
মানব জনম সার, এমন পাবে না আর,
বাহ্য দৃশ্যে ভুল নারে মন ;
কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
ওহে জীব কর আকিঞ্চন।
ক'রো না সুখের আশ প'রো না দুঃখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ, কর নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারও নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ;
সহায় সম্পদ যশ, সকলি কালের বশ,
আয়ু যেন পদ্মপত্রে নীর।
সংসার সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর প্রাণপণে,
ভয়ে ভীত হ'য়ো না মানব ;
কর কার্য বীর্যবান, যায় যাবে যাক প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মনোহর মূর্তি হেরে, ওহে জীব! অন্ধকারে
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর।
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা করে হ'য়ো না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান।
সঙ্কল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্তি রবে,
সময়ের সার—বর্তমান !
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয়।
সময়-সাগর তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর।
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে যাইবে সত্বর !

ক'রো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে।
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
রত হ'য়ে নিজ নিজ কাজে।

অনুশীলনী

১। জীবনের কি আদর্শ কবি হেমচন্দ্রের নিকট কাম্য ?

২। কবিতাটির আদর্শ দ্যোতক যে কোন আটটি পঙক্তি মুখস্থ লেখ।

৩। এই কবিতা পাঠে জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কি ধারণা হয় ?।

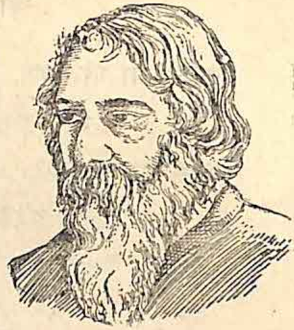
৪। ব্যাখ্যা লেখ :—(ক) দিন যায়···পদ্মপত্রে নীর।
(খ) মহাজ্ঞানী মহাজন···বরণীয়।

৫। শব্দার্থ লেখ :—বাহু, অনিত্য, কীর্তি, বরণীয়, যশোদ্বারে, সত্বর।

৬। কোনটি কোন পদ লেখ :—কাতর, দারা, বাহু, সংসারী, সম্পদ, মহাজন, প্রাতঃস্মরণীয়।

দেবতার বিদায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



দেবতা মন্দির মাঝে ভকত প্রবীণ,
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধূলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে, "গৃহ মোর নাই
এক পাশে দয়া করে দেহো মোরে ঠাঁই।"
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
"আরে আরে অপবিত্র, দূর হয়ে যা রে।"
সে কহিল, "চলিলাম"— চক্ষের নিমেষে
ভিখারি ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু, মোরে কি ছলে ছলিলে।
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।
জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়াতরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

অনুশীলনী

১। দীন-দরিদ্রই যে যথার্থ নারায়ণ ও দেবতা—এই ভাবটি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কিভাবে রূপায়িত হয়েছে, বুঝিয়ে লেখ।

২। কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক কয়েকটি পঙক্তি রবীন্দ্ররচনা থেকে উদ্ধার কর।

৩। অর্থ লেখ ও পদ নির্ণয় কর :—প্রবীণ, জপমালা, পশিল, নিমেষে, ছলিলে।

৪। ব্যাখ্যা লেখ :—জগতে⋯থাকি ঘরে।

বঙ্গমাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহ-ক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিও না ধ'রে,
দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিওনা ভালো ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালমন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙালী ক'রে—মানুষ করনি।

অনুশীলনী

১। কবিতাটিতে অঙ্কিত বাঙালীর চিত্র নিজ ভাষায় বর্ণনা কর। বাঙালী জাতির উন্নতির জন্য তাদের জীবন ও চরিত্রকে কবি কিভাবে গঠন করতে বলেছেন?

২। ব্যাখ্যা লেখ :— সাত কোটি সন্তানেরে....মানুষ করনি।

৩। শব্দার্থ লেখ :—স্নেহার্ত, গৃহক্রোড়ে, দেশান্তর, সংগ্রাম, শীর্ণ, লক্ষ্মীছাড়া, মুগ্ধ।

৪। বিপরীত শব্দ লেখ :—পুণ্য, উত্থান, দেশ, শীর্ণ, শান্ত, সাধু।

৫। বাক্য রচনা কর :—মানুষ, স্নেহার্ত, ডোর, শান্ত, ভালমন্দ।



সুখ

কামিনী রায়

[কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) সে আমলের বি. এ. পাশ এবং বেথুন স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁর 'আলোছায়া', 'দীপ ও ধূপ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য]।

কার্যক্ষেত্র ঐ প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই।
যাও বীর বেশে কর গিয়া রণ ;
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই।

পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও।
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

পরের কারণে মরণেও সুখ ;
সুখ সুখ করি কেঁদ না আর
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।

সকলের মুখে হাসি ভরা দেখে
    পার না মুছিতে নয়ন-ধার,
পরহিত ব্রতে পার না রাখিতে
    চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার ?

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
    আসে নাই কেহ অবনী 'পরে।
সকলের তরে সকলে আমরা,
    প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

অনুশীলনী

১। যথার্থ সুখ কিভাবে লাভ করা যায় ? কবি নির্দেশিত পথ আলোচনা করে তোমার অভিমত প্রকাশ কর।

২। কবিতাটি মুখস্থ লেখ।

৩। বাক্য রচনা কর :—প্রশস্ত, হৃদয়ভার, হাসিভরা, নয়ন-ধার, বিষাদ-ভার।

৪। অর্থ লেখ :—অঙ্গন, জিনিতে, পরহিত, বিব্রত অবনী।

৫। ব্যাখ্যা লেখ : -(ক) পরের কারণে···হৃদয় ভার।
    (খ) আপনারে···পরের তরে।

পরোপকার

রজনীকান্ত সেন

[রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০) পেশায় উকিল এই কবি প্রধানতঃ ভক্তি-মূলক গীতি-কবিতার রচয়িতা। তিনি কিছু হাস্যরসের কবিতাও রচনা করেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'বাণী', 'কল্যাণী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য]।

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দগ্ধ হ'য়ে করে পরে অন্ন দান,
স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির ভাবার্থ লেখ।

২। ব্যাখ্যা লেখ :—(ক) নদী···ফল।

(খ) শস্য জন্মাইয়া··· পরহিত তরে।

৩। নদী, তরু, গাভী, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, বংশী, জলধর প্রভৃতি কিভাবে নিজেদের জীবন পরোপকারে নিবেদন করে বুঝিয়ে লেখ।

৪। 'জলধর' কথাটির একাধিক প্রতিশব্দ দাও।

৫। সাধুর·· পরহিত তরে—নিজ ভাষায় বাক্যটির মর্মার্থ লেখ।

সবারে বাস্‌রে ভাল

অতুলপ্রসাদ সেন

[অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪) বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অধিবাসী। লক্ষ্ণৌতে ব্যারিস্টারি করবার সময় সঙ্গীত রচনা ও চর্চায় মনোনিবেশ করেন। সহজ ভাষা ও ছন্দে গাঁথা তাঁর গানগুলি বাঙালী সমাজে সর্বত্র সমাদৃত]।

সবারে বাস্‌রে ভাল,
নইলে তোর মনের কালো ঘুচবে নারে।
আছে তোর যাহা ভালো
ফুলের মত দে সবারে।
করি তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন,
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে।
যারে তুই ভাবিস ফণী
তারো মাথায় আছে মণি,
বাজা তোর প্রেমের বাঁশী,
ভবের বনে ভয় বা কারে ?
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে
রাখবি কারে, কারে ফেলে ?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ওপারে।

অনুশীলনী

১। ভালবাসার সার্থকতা কোথায় ?
২। ভালবাসা বলতে এখানে কবি মনের কোন ভাবকে বুঝিয়েছেন ?
৩। ব্যাখ্যা লেখ :—করি তুই···যারে তারে।
৪। অর্থ লেখ :—মনের কালো আপন, আপণ, ফণী, মণি।

দিদিহারা

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

[যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) আধুনিক খ্যাতনামা বাঙালী কবিগণের অন্যতম। রবীন্দ্র-মণ্ডলের এই কবির রচনা ছন্দের বৈচিত্র্য, ভঙ্গীর নবীনতা ও ভাষার লালিত্যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। 'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'মহাভারতী' প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিছুকাল তিনি 'মানসী' ও 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন]।

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলোক-বলা কাজ্‌লা দিদি কই ?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে   থোকায় থোকায় জোনাই জলে,—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই ;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই ?

সেদিন হ'তে দিদিকে আর কেনই বা না ডাকো,
দিদির কথায় আঁচল দিয়ে মুখটি কেন ঢাকো ?
খাবার খেতে আমি যখন   'দিদি' বলে ডাকি তখন,
ওঘর থেকে কেন মা আর দিদি আসে নাকো,
আমি ডাকি,—তুমি কেন চুপটি করে থাকো ?
বল মা দিদি কোথায় গেছে, আস্‌বে আবার কবে ?
কাল যে আমার নতুন ঘরে পুতুল বিয়ে হবে !
দিদির মত ফাঁকি দিয়ে   আমিও যদি লুকোই গিয়ে—
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে ?
আমিও নাই, দিদিও নাই—কেমন মজা হবে !

ভূইচাঁপাতে ভরে গেছে শিউলি গাছের তল,
মাড়াস্ নে মা পুকুর থেকে আন্‌বি যখন জল ;
ডালিম গাছের ডালের ফাঁকে বুলবুলিটি লুকিয়ে থাকে,
উড়িয়ে তুমি দিয়ো না মা ছিঁড়তে গিয়ে ফল ;—
দিদি এসে শুন্‌বে যখন, বলবে কি মা বল্ ।
বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
এমন সময়, মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?
বেড়ার ধারে, পুকুর পাড়ে ঝিঁঝিঁ ডাকে ঝোপে ঝাড়ে,
নেবুর গন্ধে ঘুম আসে না— তাইতো জেগে রই
রাত হ'ল যে, মাগো, আমার কাজ্‌লা দিদি কই ?

অনুশীলনী

১। কবিতাটির মর্মার্থ নিজ ভাষায় লেখ।

২। কাজ্‌লা দিদির অনুপস্থিতিতে ছোট ভাই বা বোনের মনে যে অভাব-বোধ জেগেছে, কবিতাটির মর্ম অনুসরণ করে নিজ ভাষায় তার বর্ণনা দাও।

৩। বাঁশবাগানের···কাজ্‌লা দিদি কই ?—পংক্তিদুটি কার উক্তি ? কেন সে মাকে দিদি সম্পর্কে প্রশ্ন করছে ?

৪। অর্থ লেখ :—শোলোক-বলা, থোকায় থোকায়, ঝোপে ঝাড়ে, জোনাই।

৫। বাক্য রচনা কর :—ফুলের গন্ধে, আঁচল, ঝিঁঝিঁ ডাকে, বেড়ার ধারে।

৬। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

জগৎ-কবি রবীন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) বিশিষ্ট গদ্য রচয়িতা অক্ষয়কুমার দত্তর পৌত্র, রবীন্দ্র-মণ্ডলের কবি। সমসাময়িক ঘটনা ও ব্যক্তির উপরে নানা ছন্দে তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলে তাঁর উদ্দেশে কবি সত্যেন্দ্রনাথ এই কবিতাটিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন]।

জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব !
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব !
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইল মানি'
হে গুণী তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব।
বঙ্গ-বাণী কুঞ্জে তুমি আনিলে শুভ লগ্ন,
বাজালে বেণু মোহন তানে পরাণ হ'ল মগ্ন !
বিষাণ যবে বাজালে মরি,
গলিয়া শিলা পড়িল ঝরি'
মিশিল স্রোতে বন্ধ ধারা, পাষাণ কারা ভগ্ন।
বাজাও কবি ! আলোক বীণা মধুর নব ছন্দে,
হৃদয় শতদল সে তুমি ফুটাও সুধা-গন্ধে,
সে ভাব ওঠে প্রাণের মাঝে
তোমার নামে সকলি আছে,
তোমার নামে মেতেছে দেশ, — মিলেছে মহানন্দে।

অনুশীলনী

১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর মতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার বৈশিষ্ট্য কি ? তাঁকে জগৎ-কবি কেন বলা হল ?

২। বঙ্গবাণী কুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ কি শুভলগ্ন এনেছিলেন ? [উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও সঙ্গীত প্রতিভার উপর জোর দিতে হবে]।



[সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) ময়মনসিংহের সাহিত্য-সেবী সুপ্রসিদ্ধ রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর পিতৃদেব পরিচালিত কিশোরদের 'সন্দেশ' পত্রিকায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। ছড়া জাতীয় প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় তিনি অদ্বিতীয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। নিতান্ত অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর পুত্র]।

রামগরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাস্‌ব না না, না না!"
সদাই মরে ত্রাসে ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস্‌ যদি
মারব কিন্তু তোকে।"

যায় না বনের কাছে কিংবা গাছের কাছে
দখিন হাওয়ার সুড়্‌সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে।
সোয়াস্তি নেই মনে মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠছে ফেঁপে
কান পেতে শোনে!
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।
হাস্‌তে হাস্‌তে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগ্‌ছে ব্যথা
বুঝ্‌ছে নাকি তারা?
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম নিজের ভাষায় লেখ।

২। এই কবিতায় নিয়ন্ত্রণের কঠোর নিয়মকানুনের ফলাফল সম্পর্কে কবি কি ইঙ্গিত দিয়েছেন? এই নিয়মকানুন স্বাভাবিক বিকাশের পথ রোধ করে না কি?

৩। বাক্য রচনা কর:—ছানা, মিট্‌মিটিয়ে, সুড়সুড়ি, সোয়াস্তি, সারা, ঠাসা।

৪। কবিতাটি মুখস্থ লেখ।

কুলি-মজুর



কাজী নজরুল ইসলাম

[বিদ্রোহী কবির জন্ম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে। তিনি প্রথম জীবনে সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তাঁর দেশাত্মবোধক ও আত্মশক্তি উদ্দীপক কবিতাগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। স্বভাবতঃই খেটে-খাওয়া মানুষ কুলি-মজুরের বেদনা ও 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল' দূর করার রণধ্বনি তাঁর কবিতা ও গানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি প্রেম ও প্রকৃতি পূজার অজস্র সঙ্গীত রচনা করে স্বয়ং সুরারোপ করেছেন। তিনি কিছুদিন ইংরেজের কারাগারে বন্দী ছিলেন]।

দেখিনু সে দিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল!
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প শকট চলে,
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ? চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল?
রাজপথে তব চলিছে মোটর সাগরে জাহাজ চলে,

রেলপথে চলে বাষ্প শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো তো এসব কাহাদের দান ? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ? ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জাননাক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ ঐ জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে।
আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান !

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম লেখ।

২। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার সমৃদ্ধিতে কুলি-মজুরদের অবদান কি ?

৩। কুলিদের ন্যায্য পাওনা থেকে কুলি-মজুরদের কিভাবে বঞ্চিত করা হয়ে থাকে, এই কবিতা থেকে তার একটি দৃষ্টান্ত দাও।

৪। ব্যাখ্যা লেখ :—

(ক) ঐ দধীচিদের······তলে—

(খ) তুমি জাননাক'······মানে।

(গ) আসিতেছে······ঋণ—

(ঘ) তোমারে সেবিতে······উত্থান।



[বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪—) দৈনিক সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, চলচ্চিত্র বেতার প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। কৈশোরে 'পাঁক' নামক উপন্যাস রচনা করেন। তারপর গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, গোয়েন্দা কাহিনী, কিশোরপাঠ্য কাহিনী, অনুবাদ প্রভৃতি সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রেই পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তাঁর লেখা 'প্রথমা', 'সম্রাট', 'পুতুল ও প্রতিমা', 'নিশীথ নগরী', 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে', 'সাগর থেকে ফেরা' (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত), 'ঘনাদার আরও গল্প' প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়। তিনি আকাদমী পুরস্কারও লাভ করেছেন]।

রাতের জোনাকীগুলি চরায় কারা ?
সারারাত ভরে' কারা দেয় পাহারা ?
তাদের রাখাল বুঝি ছোট্ট পরী—
মাঠের আঁধারে ছোটে ফড়িঙে চড়ি'
জোনাকী চরায় বুঝি ছোট্ট পরী !

রাখালের মত তারা কোথাও ব'সে
বাজায় কি মেঠো বাঁশী শুয়ে আলসে ?
রাখালের মত তারা আলসে বসে ?

পরী-রাখালের গান কি হিজিবিজি !
তাদের বাঁশীর সুর রাতের ঝিঁঝিঁ।
মানে নেই সে গানের, কি হিজিবিজি !

অনুশীলনী

১। কবিতাটির সারমর্ম লেখ।

২। জোনাকী কিভাবে রাতের আকাশের শোভা বাড়িয়ে তোলে—তার বর্ণনা দাও।

৩। ছন্দ ও মাত্রা ঠিক রেখে কবিতাটি মুখস্থ লেখ।

৪। শব্দার্থ লেখ :—চরায়, আলসে, হিজিবিজি।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—(ক) সারারাত ভরে — পাহারা ? (খ) তাদের রাখাল — ছোট্ট পরী —(গ) বাজায় — মেঠো বাঁশী শুয়ে — ? (ঘ) তাদের — সুর — ঝিঁঝিঁ। (ঙ) মানে — সে গানের কি —

৬। 'আলসে' কথাটি দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করে বাক্য রচনা কর।

৭। পদ নির্ণয় কর :— চরায়, পাহারা, আঁধারে, বাঁশী, সুর।